জন্মের মত আড়ি

পেয়েছে। তাতে কি লজ্জা আছে! দাঁত বার ক'রে হাসতে-হাসতে বলে—তাজ্জব কাণ্ড! বারো পেলুম কী করে? আমি গম্ভীরমুখে বলি, কেন নিরানব্বই পাবি ভেবেছিলি নাকি? ঠাট্টা ক'রে বলি। হাবাটা চোখ পাকিয়ে বলে—নিরানব্বই না হোক, অন্তত সাতাশি পাওয়া তো উচিত ছিলো। আচ্ছা, জিজ্ঞেস্ করবো অম্বিকাবাবুকে।

পরের ঘণ্টাতেই অম্বিকাবাবুর ক্লাশ। গোপ্‌লা সত্যি সত্যি উঠে দাঁড়ালো। —স্যার, একটা কথা জিজ্ঞেস্ করবো?

—কী কথা?

—ইংরিজিতে আমি বারো পেলুম কি করে?

—কেন, খুব কম পেয়েছো নাকি?

—আজ্ঞে না, বড্ডো বেশি ঠেক্‌ছে। আমি মাত্র পাঁচের উত্তর লিখেছিলুম।

ক্লাশ শুদ্ধ ছেলে হেসে উঠলো, আর অম্বিকাবাবু গম্ভীরমুখে বললেন: তুমি আসলে দুই পেয়েছিলে, তবে এবার জেনারেল গ্রেস দশ নম্বর দেওয়া হয়েছে।

গোপ্‌লাটা মিটমিট ক'রে আমার দিকে তাকিয়ে ফ্যা—ফ্যা করে হাসতে লাগলো। ইস্—আমি যেন সত্যি সত্যি ভেবেছিলুম উনি সাতাশি পাবেন। সাতাশির ধ্যান করে যেন সাত জন্ম ভরে! ইংরিজিতে হাইয়েষ্ট মার্কই তো পঁচাত্তর! আমিই পেয়েছিলুম সেটা।

লাড্ডুমার্কা হ'লে কী হবে, আমার সঙ্গে মেশবার ওঁর সখ আছে খুব। আমি তো ওকে আমলেই আনিনে, পারতপক্ষে কথাও বলিনে—কিন্তু হ'লে হবে কী, আমার পিছনে ও ঘুরঘুর করছেই! হ্যাঁ ভাই, ম্যাপ আঁকে কী ক'রে, গ্রীনল্যাণ্ডের রাজধানী কী, আকবর কোন্ সালে জন্মেছিলেন, কমপ্লেক্স

DHIREN BAL

খাতাখানা আমি নিলুম, কিন্তু একটাও কথা বললুম না। পাগল হয়েছো—ওর সঙ্গে আমি আর কথা বলবো জীবনে!

তাই বলে কি ওর হাত থেকে রেহাই আছে ভেবেছো। সেই যে ঘ্যানঘ্যান প্যানপ্যান সুরু করলে, পাগল হ'য়ে যাই আরকি। হ্যাঁ ভাই, রাগ করলে? রাগ করলে অ্যাঁ? আর করবো না, এরকম রাগ করিস্‌নি। শেষটায় ব'লে ফেললুম—তোর উপর আবার রাগ করবো কী? তুই কি একটা মানুষ।

ও নিতান্ত কাঁচুমাচু মুখ ক'রে বললে—ঠিক বলেছিস ভাই, আমি আর গাধা খুব বেশী দূর নই। দেখবি? বলেই নীচু হয়ে কনুইটা মেঝেতে ঠেকিয়ে মাপতে আরম্ভ করলো—এক হাত, দু'হাত, তিন হাত—তারপর আমার পায়ের কাছে এসে শেষ করলে—প্রায় চার হাত। দেখলি তো? আমি আর গাধা পুরো চার হাত দূরেও নই।

ফাজিল, ইষ্টু পিট, জানোয়ার, ডঙ্কি-মঙ্কি।

বাঃ, উনি মনে করলেন ভারি একটা বাহাদুরি হ'লো। এসব রসিকতা ত আজকাল ক্লাশ টু-র ছেলেরাও করে না। আরে, আমি যদি ওকে নিয়ে ফাজলেমি আরম্ভ করি, তাহলে ও এই ইস্কুলেই টিঁকতে পারবে না সেটা ভেবে দেখেছে কখনো? আমি নিতান্ত ভালোমানুষ ব'লেই তো! এগুলো আমার ঘোরতর বদ্‌ লাগে ব'লেই তো! ছিঃ-ছিঃ আমি যদি ওর মত ইকড়ি-মিকড়ি ডাইনি বুড়ি আরম্ভ করি তা'হলে হেডমাষ্টার মশাই কী ভাববেন।

এর পর অবশ্যি ওর সঙ্গে মোটে কথাই বলিনি। কত ছলছুতো ক'রে কাছে ঘেঁষতে চেয়েছে, আমি যেন ওকে চিনিই না। ও এদিক দিয়ে আসে তো আমি ওদিক তাকাই। জব্দটা কে হলো? ও আমাকে শুনিয়ে ঠাট্টা করে আর ছড়া কাটে যেন হঠাৎ ভুল করে কাছে এসে পড়ে মুখ ভেংচিয়ে দৌড় দেয়—ফুঃ, তাতে আমার বয়েই গেল!

এমনি ক'রে য়্যানুয়েল পরীক্ষার দিন ঘনালো। অ্যারিথমেটিকটা আমার

কাছে মাথামুণ্ডু লাগে, তারই আঁক কষতে-কষতে দু'খানা খাতা ভ'রে ফেলেছি এমন সময় একদিন গোপ্‌লা আমার বাড়িতে এসে উপস্থিত। একেবারে অন্য মানুষ, চেনবার উপায় নেই। তোমরাই বলো, কেউ বাড়িতে এলে কি রাগ দেখাতে পারে ভদ্দরলোকে! ডেকে এনে বসালুম, চা আর বেগুনি খাওয়ালুম, লজ্জায় গোপ্‌লা মুখই তুলতে পারে না। যা-ই বলো, বইয়ে ঠিক কথাই লিখে, নোব্‌ল রিভেঞ্জের মতো কিছুই নেই।

অনেকক্ষণ পরে গোপাললাল চিঁ চিঁ করে আসল কথা পাড়লে—পরীক্ষা এসেছে সারা বছর তো ডঙ্কি-মঙ্কি সেজে বেড়ালো, এখন বুকের ধুকধুকুনি উঠেছে আরকি।

তা এই অধমের কি করতে হবে?

—ছাখ্‌ ভাই, অন্যগুলো যেমন-তেমন, অঙ্কে এবার নির্ঘাৎ ফেল করবো, আর ফেল করলে বাবা বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবেন। তুই যদি—এই পর্যন্ত বলে গোপ্‌লা আর বল্‌তে পারলে না।

দয়া হ'লো। তোমারও দয়া হ'তো তখন ওকে দেখলে। আমি বললুম—বেশ তো, আসিস আমার এখানে, দেখিয়ে দেব তোকে অঙ্কগুলো। তবে সময় খুবকম—

—ওতেই হবে ভাই, আমি তো আর তোদের মত ছেলে নই, কোনোরকমে পাশ করতে পারা নিয়ে কথা।

হেঁ-হেঁ এখন তো দিব্যি সুর নরম হ'য়ে এসেছে। তা তোমরা আমাকে মন্দ বলো আর যা-ই করো, আমি মনের মধ্যে রাগ পুষে রাখতে পারিনে। বেচারার বুদ্ধিসুদ্ধি যে কম সে তো আর ওর দোষ নয়।—নেহাৎই ফেল মারবে পরীক্ষায়, আমি না-হয় একটু দেখিয়ে দিলাম। বটকেষ্টকে না হ'লে ওদের যখন চলেই না—

গোপ্‌লা তো খাতা পেন্সিল নিয়ে আসে যায়, মাথা নিচু করে আঁক কষে আমার সঙ্গে। মনে কোরো না জাঁক করছি, তবে এবারে ও যে ক্লাশের পরীক্ষায় প্রোমোশন পেলো তা আমারই জন্যে। আর কেউ না জানুক এ কথা, ও নিজে তো জানে। মুখে না বলুক, মনে-মনে জানে। প্রথম দিনে ওকে বললুম, এস রেকারিং

ডেসিমেল থেকে আরম্ভ করি। গোপ্‌লাটা বলে কী জানো? বলে, রেকারিং ডেসিমেল কী জিনিষ ভাই? আমি তো হাঁ! যা-ই হোক, টেনে-হিঁচড়ে ওকে তো বোঝানো গেলো সব। আরে হাঙ্গামা কি কম গিয়েছে আমার! এদিকে মজার কথা শোনো. একরকম তো তৈরি করে আনা গেছে, পরীক্ষার আর বেশীদিন বাকি নেই, তখন গোপ্‌লাটার বুঝি মাথাই খারাপ হয়ে গেলো না কী। ধরো, দু'জনেই একটা আঁক লিখে নিয়েছি, বেশ শক্ত বিদ্‌ঘুটে ব্যাপার, দু'মিনিট পরেই গোপ্‌লা মুখ তুলে বলে—হয়েছে। বলে কী, কত হ'লো আন্‌সার? পয়েন্ট থ্রি। বই খুলে দেখি, তাই তো। আমি ধীরে সুস্থে বুঝে সুজে করলুম, আমারও তা-ই হ'লো। এর পর যে-কোনো অঙ্কই ওকে দিই, দু' মিনিট পরেই বলে, হয়েছে। বাড়াবাড়ি দেখলে রাগ হয়।

ঢোলগোবিন্দ ভ্যাবলাটা বলে—জানিস্‌নে, গোপ্‌লাটার অঙ্কে বেশ মাথা।

হো, তাই নাকি? তা এ ছাইভস্ম অঙ্ক আমার ভাল লাগেনা তা তো সকলেই জানে, কিন্তু তাই ব'লে আশির নিচে নম্বর তো চোখে দেখলুম না। যে-মাথা দিয়ে পঁয়ত্রিশ পাওয়া যায় তা আমার না-ই বা থাকলো—কী বলো তোমরা? আর ঐ য্যাম্নুয়েলে গোপ্‌লা যে হঠাৎ এক লাফে নব্বই পেলো অঙ্কে, তা কি—থাকগে, নিজের কথা আর বলবো না।

অঙ্কে নব্বই পেয়ে পাশ ক'রে গোপ্‌লার অবস্থা একেবারে টাকডুমাডুম। দেখে হাসি পায়। এদের যেন এ-সব মোটে সময়ই না। আমি সব পরীক্ষাতেই প্রায় ফার্স্ট হই, এবারেও হয়েছি, কিন্তু তাই ব'লে—থাক্‌গে, নিজের কথা বললে ভালো শোনায় না, কিন্তু নিজের কথা না-ব'লেও উপায় নেই এই তো মুস্‌কিল। তা গোপ্‌লা সেদিন আহ্লাদে আটখানা হ'য়ে আমার কাছে এসে বলে—নতুন কেলাসে উঠলুম ভাই, এবার আয় একটু ঘুরে বেড়াই।

আমি মোটে গরজ করলুম না। ইস্‌—অঙ্কে নব্বই পেয়ে একেবারে গাছে উঠেছে যেন। আরে আমার যদি একটুর জন্যে সেই ইকুয়েশনটা ভুল হ'য়ে না

যেতো, তাহ'লে আমি যে সাতানব্বই পেতুম সে-খেয়াল আছে।

কিন্তু গোপ্‌লাটা নাছোড়বান্দা। কাল এসে বলছে—আমার এক মাসিমা থাকেন আলিপুরে, কাল আমি যাচ্ছি তাঁর ওখানে, তুই যাবি ?

—আমি যাবো কেন ?

—আহা—রাগ করলি ? মাসিমাকে আমি বলেছিলুম কিনা তোর কথা, যে তুই আমাদের ক্লাশের ফার্ষ্ট বয়, তিনি দেখতে চেয়েছিলেন তোকে।

আমি চুপ ক'রে রইলুম।

যাবি ?

ও এমন কাঁচুমাচু মুখ ক'রে বললে যে রাজি হ'য়ে গেলুম। গোপ্‌লাটা যেমনই হোক্, ওর মাসিমা কিন্তু বেশ ভালো। হয়তো কবে থেকেই গোপ্‌লাকে বলছেন কথাটা, ওটা আবার যা গেঁতো।

—কাল তাহ'লে থাকিস চারটের সময়। আমি আসবো। ওঃ, খাওয়াবে খুব।

বলো কেন আর, আজ গেছলুম ওর সঙ্গে ওর মাসীমার বাড়ী। এই ফিরছি। সেজে-গুজে ফিটফাট হ'য়ে গেছি, জামার পকেটে আমার তিনটে ফাউন্টেন পেনই আটকে নিয়েছি, পাশাপাশি। বেশ দেখায়। গোপ্‌লার মাসিমা বি-এ পাশ, লেখাপড়ার দিকে খুব ঝোঁক। আমাকে নিশ্চয়ই খুব একটা শক্ত বই পড়তে দিয়ে বলবেন—বলো তো মানেটা। হায়রে, উনিতো জানেন না ও-সবই আমার কাছে জল।

ও বাড়ীতে গিয়ে প্রথমে তো খুব এক চোট খাওয়া হ'লো। তারপর গোপ্‌লার মাসিমা এসে বসলেন। ওঃ, কী রকম ক'রে তাকিয়ে আছেন আমার দিকে, গোপ্‌লাটা আমার কথা না জানি কত বলেছে। যাই বলো, ছেলেটার মনটা ভালো।

হঠাৎ ওর মাসিমা জিজ্ঞেস করলেন—তোমার বাবার বাত কেমন আছে ?

আমি অবাক হ'য়ে গিয়ে জবাব দিলুম—আজ্ঞে আমার বাবার তো বাত নেই।

উনি চট্ ক'রে একবার অন্যদিকে একটু তাকিয়ে বললেন—তোমাদের না এর মধ্যে বাড়ি বদল করার কথা ছিলো ?

আমি তৎক্ষণাৎ জবাব দিলুম—আমাদের তো নিজেদের বাড়ি।

এর পর উনি বেশ কটমট ক'রে অন্যদিকে একটু তাকিয়ে রইলেন। তারপর আবার বলেন—তোমার চেহারাটা একটু খারাপ দেখছি।

আমি বললুম—আজ্ঞে না, আমার তো—

হঠাৎ উনি খ'লে উঠলেন—তুমি দেখছি অল্প বয়েসেই বড্ড ফাজিল হয়েছো!

এবার সত্যি-সত্যি জন্মের মত আড়ি।

ও—কথাটা যে আমাকেই বলা সেটা বুঝতে আমার অন্তত: সাত সেকেণ্ড সময় লাগলো। সঙ্গে সঙ্গে সবই বুঝতে পারলুম। এরপর আর কী বলবো। রাস্তায় বেরিয়ে ঐ বেবুনটা বললে—ছ্যাখ ভাই, আমার মাসিমা ভয়ঙ্কর ট্যারা, আমার সঙ্গে কথা বললে মনে হবে তোর দিকে তাকিয়ে বলছেন। আমাদের একরকম অভ্যেস হ'য়ে গেছে, নতুন লোকের বড়
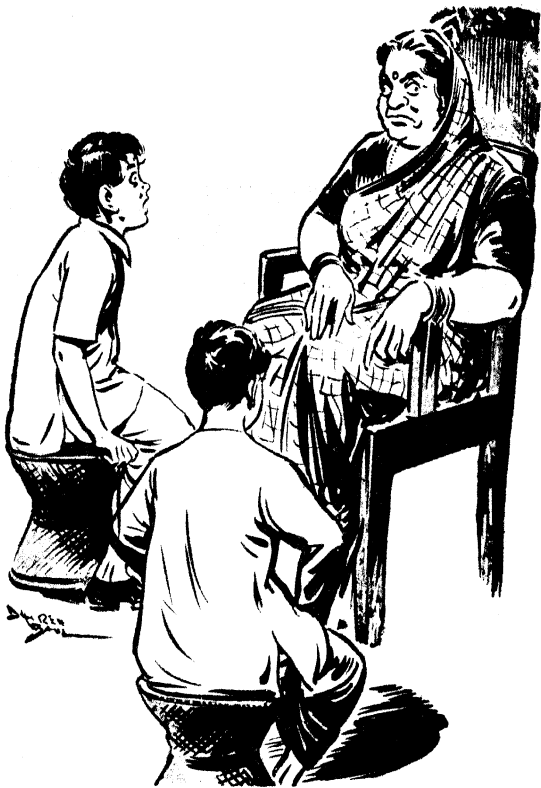
অসুবিধে হয়! তোকে আমার আগেই বলে নেওয়া উচিত ছিলো—রাগ করলি?
হ্যাঁ, বল্ না ভাই।

বল্ না ভাই! আর আমি ওর সঙ্গে কথা বলবো জীবনে! এবার সত্যি-সত্যি জন্মের মত আড়ি।

LOVE ME AND
LOVE MY DOG
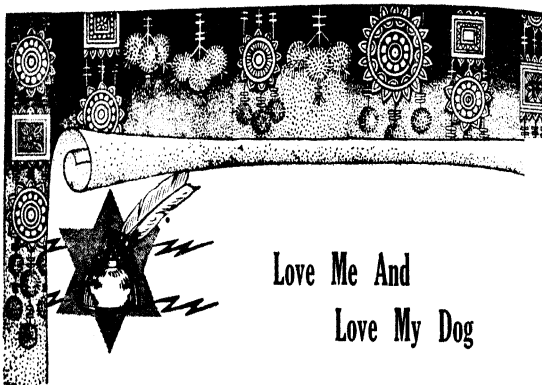
Love Me And Love My Dog

আমার জ্যাঠতুতো দাদা হুতুমগঞ্জের মাজিষ্ট্রর। হুতুমগঞ্জ বিখ্যাত জায়গা, সেখানে পথে সাপ, ঘাটে সাপ, বাথরুমে সাপ, খাটের তলায় সাপ, কপাল ভালো হ'লে বালিশের তলায়ও সাপ! শুনতে পাই সেখানে মানুষ আর সাপ পারস্পরিক সখ্যতায় দিব্যি বসবাস করছে; মানুষেরা সাপ মারবার দরকার বোধ করে না, আর সাপেরা যে মাঝে মাঝে দু' একটা মানুষ মেরে ফেলে তার কারণ বোধ হয় শুধু এই যে এতদিন মানুষের পাশাপাশি থেকেও তারা তাদের বন্য হিংস্র প্রকৃতি সম্পূর্ণ ভুলতে পারছে না।

এ-হেন হুতুমগঞ্জে যাবার জন্যে মাঝে মাঝে মেম-বৌদির নেমন্তন্ন পেতুম। যা ভাবছো তা নয়। আমার দাদা বিলেতে গিয়ে মেম বিয়ে করেননি, ফিরে এসে খাস বাঙালি বিয়ে করেছেন। তবে মাজিষ্ট্রর হ'লে একজন ভদ্রলোক সাহেব হ'য়ে যান, এবং তাঁর স্ত্রী হন মেমসাব তা তোমরা নিশ্চয়ই জানো। একটুও

বাড়িয়ে বলছি না, মেম-বৌদি নিজের হাতেই আমাকে চিঠি লিখতেন। বাংলাতেই লিখতেন। তবে সে-বাংলা মনে মনে ইংরিজিতে তর্জমা ক'রে নিয়ে তবে আমি তার মানে বুঝতুম। এমনকি, চিঠির গোড়াতে 'প্রিয় রণেন'ও মনে-মনে "ডিয়ার রণেন" পড়লে তবে সেটা পরিষ্কার বোঝা যেতো। আমি যেন একবার হুতুমগঞ্জে কয়েকটা দিন কাটিয়ে তাঁদের 'সুখী' করি, প্রায় চিঠিতেই এই অনুরোধ থাকতো।

বলা বাহুল্য, তাঁর অনুরোধ আমি রক্ষা করতে পারিনি। যে-সব সাপ দেখতে মানুষের মতো, কলকাতায় তারা সব সময়েই চারিদিকে কিলবিল করছে; তবু, যারা সাপও বটে, দেখতেও আবার সাপের মতো, তাদের কথা ভাবতেই আমার গা-টা কেমন শির শির করে ওঠে। এটা আমার দুর্ব্বলতা বলতে পারো, সাহসের অভাব। এই সামান্য সাহসের অভাবে, কিংবা অসামান্য সাহসের অভাবে হুতুমগঞ্জে যাওয়া আমার অদৃষ্টে ঘটলো না। অবশ্য ম্যাজিষ্টরের অতিথি ব'লে সাপেরা হয়তো সমীহ ক'রে চলতো, কিন্তু নিজে তো আর আমি ম্যাজিষ্টর নই···বিশ্বাস কী? দাদা-বৌদি অনায়াসে থাকতে পারেন, তাঁদের পাইক আছে, পেয়াদা আছে, মোটর আছে; বন্দুক আছে, কলকাতা থেকে তাঁদের কেক-বিস্কুট যায়, তাঁরা চাপবেন ব'লে রেলগাড়ি ইষ্টিশানে ছত্রিশ মিনিট দাঁড়িয়ে থাকে—তাঁদের ভাবনা কী। তাছাড়া, বাংলাদেশের কোনো সাপেরও এত বড়ো সাহস নেই যে আস্ত একটা ম্যাজিষ্টরের গায়ে ছোবল তুলবে। তার উপর এ-ও শুনেছি যে হুতুমগঞ্জের সাপেরা নাকি ভারি ভালোমানুষ। সেখানকার একজন উকিল গল্প করলেন যে ম্যাজিষ্টরের কুঠির গেটের দু'দিকে দুটো কেউটে নাকি ব'সে থাকে, সাহেব যখনই বেরোন কি ঢোকেন, ফণা দুলিয়ে-দুলিয়ে সেলাম করে। চাকর, মেথর, কুলি কি ফিরিওলাকেও কিচ্ছু বলে না, কিন্তু সহরের কোনো ভদ্রলোক ঢুকতে গেলেই···উকিলবাবুকে নাকি একবার বিষম তাড়া করেছিলো।

সুখী রাজপুত্র

তবে এটা সম্ভবত গল্পই।

য-ই হোক্‌, এ গল্প শোনবার পর আমার হুতুমগঞ্জে যাবার যেটুকু ইচ্ছা ছিলো, তাও নিবে গেলো। কয়েক মাস পরে খবর পেলুম দাদা আলিপুরে বদলি হয়েছেন। কলকাতায় এসে বাড়ি ভাড়া নিয়ে তাঁরা যখন বেশ গুছিয়ে বসেছেন, তখন মনে হ'লো এইবার মেম-বৌদির নিমন্ত্রণ রক্ষা করা যেতে পারে। অতএব এক বিকেলবেলায় কলেজ থেকে ফিরে চা খেয়ে (কম ক'রেই খেলুম) যাত্রা করলুম বালিগঞ্জের দিকে।

বলতে লজ্জা নেই, সাজগোজটা পরিপাটি রকমই করলুম। জুতোটা নিজের হাতেই ঘষতে ঘষতে আয়নার মতো ক'রে তুললুম। আয়নার সামনে স্থির হ'য়ে ব'সে চুলটা অনেকক্ষণ ধ'রে ফেরালুম। তারপর ধোপদুরস্ত ধুতি-পাঞ্জাবি প'রে বেরলাম। যা-ই বলো, আমাদের মতো মানুষের-মাজিষ্টর-দাদা থাকা যেন অজীর্ণ রোগীর ভুরি-ভোজন; ভালো জিনিসগুলো চোখে দেখেই খুসি থাকতে হয়, আর পেটে যেটুকু গেলো তার ঢেঁকুর তুলতে-তুলতে প্রাণান্ত।

ট্রাম থেকে নেমে মাইলখানেক হাঁটা পথ। তাঁদের নিজেদের, এবং বন্ধুবান্ধব সকলেরই গাড়ি আছে; আমাদের মতো ট্রামসওয়ার ও পদাতিকেরই হয় মুস্কিল। তার উপর, ওল্ড বালিগঞ্জ রোডটাই এমন যে সেখান দিয়ে হাঁটা যায় না: শাঁ শাঁ ক'রে মোটর ছুটছে, তার উপর আবার বাসগুলোর হনুমানের মতো লাফ়। হোঁচট খেয়ে খেয়ে, চমকে থমকে ও থেমে, মোটর-চাপা পড়তে পড়তে বেঁচে যেতে যেতে যখন বালিগঞ্জ পার্কে দাদার বাড়ির দরজায় এসে পৌছলুম, তখন আমি হাঁপাচ্ছি ও ঘামছি। মস্ত কম্পাউণ্ডওলা বাড়ি

গেটে একটা সাজগোজ করা দরোয়ান ব'সে।

—ক্যায়া মাংতা? দস্তুরমতো রূঢ় ভাষায় ব্যাটা আমাকে জিজ্ঞেস করলে।

আমি ঘাবড়ে গিয়ে বললুম—সাব্ হ্যায়?

—কোন্ সাব?

—গুপ্ত সাব?

—আভি কোর্টসে নেই আয়া। মোলাকাৎ কর্নেকো টাইম মর্ণিং হ্যায়, ন' বাজে।

আমি মহা ফাঁপরে পড়লুম। ব্যাটা দেখি আমাকে বাড়িতেই ঢুকতে দিতে চায় না। এখন আমি কী বলি? মেম-সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে চাই বললে চাইকি পুলিশেই ধরিয়ে দেবে।

শেষটায় সাহস ক'রে ব'লে ফেললুম—গুপ্ত সাহেব হামারা ভাই হ্যায়। মেমসাব্‌কো বোলো রণেনবাবু আয়া।

—বাবুলোগকো টাইম মর্ণিং। মেম-সাব্‌কো আভি বিউটি-স্ল্যাপকা টাইম হ্যায়। বিউটি-স্ল্যাপ আবার কী বস্তু, মনে মনে আমি ভাবলুম।

কোথা থেকে আমার এত সাহস এলো জানিনে হঠাৎ একটু ধমকের সুরেই ব'লে ফেললুম—যাওনা তুম, বোলো মেমসাবকো।

লোকটা খানিকক্ষণ আমার মুখের দিকে কেমন একরকম ক'রে তাকিয়ে রইলো; তারপর আপাদমস্তক আমাকে নিরীক্ষণ ক'রে বললে—কার্ড হ্যায়?

—নেই হ্যায়।

তখন লোকটা তার পকেট থেকে অতি নোঙরা চিটচিটে একটা নোটবই বার করলে, আর একটা অতি ক্ষুদ্র ভোঁতা পেন্সিল, আমি কোনরকমে নিজের নামটা লিখে দিলুম। অতি কষ্টে ও অত্যন্ত অনিচ্ছায়

সেই কাগজের টুকরো হাতে ক'রে প্রকাণ্ড জাঁদরেল পালোয়ান ভৃত্য চলে গেলো ভিতরে।

মিনিট দুই পরে ফিরে এসে বললে—আইয়ে। তার মুখ দেখে স্পষ্ট বুঝতে পারলুম যে তার কর্ত্রী যে আমা-হেন জীবকে এ-সময়ে অভ্যর্থনা করলেন এতে সে মনে-মনে ঘোরতর রুষ্ট।

তারই নেতৃত্বে প্রকাণ্ড লন পার হ'য়ে বাড়িতে গিয়ে…হ্যাঁ, শেষ পর্য্যন্ত উঠলুম বটে, কিন্তু সেটাও সহজ হ'লো না। বাড়ির কাছাকাছি আসতেই বারান্দা থেকে অন্ততঃ দশটা কুকুর প্রচণ্ডস্বরে গর্জ্জন ক'রে উঠলো, আর আমার দিকে যে জানোয়ারটা দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে তেড়ে এলো, এখন ঠাণ্ডা মাথায় তাকে কুকুর বলতে পারছি বটে, কিন্তু তখন আমার মনে হয়েছিলো নতুন রকমের কোনো বাঘ-টাগ হবে। সেটা অন্ততঃ দশ বছরের ছেলের সমান উঁচু, গায়ে ডোরা কাটা, আর গলার আওয়াজ অতি ভয়ঙ্কর।

দরোয়ান খুব অমায়িক ভাবে বললে—আইয়ে, কুচ ডর্ নেই। তারপর সে ঐ জন্তুটার গায়ে হাত বুলিয়ে স্নেহ-শীতল সুরে ডাকলে—ঠার যাও, মুসো ঠার যাও।

কিন্তু মুসোর ঠার যাবার কোন লক্ষণই দেখা গেলো না। কেন যে সে আমার গলা কামড়ে ধ'রে আমাকে কয়েকটি মাংসখণ্ডে পরিণত করলে না, কী ক'রে যে আমি আজ পর্য্যন্ত বেঁচে আছি, সেটা আমার কাছে এখনো রহস্য। নিঃসাড়, অবশ হ'য়ে পাথরের মূর্ত্তির মতো দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময় কুকুরের কলরোল ছাপিয়ে একটি অতিশয় মিহি কণ্ঠস্বর আমার কানে পৌঁছলো—Shut up Musso.

সঙ্গে-সঙ্গে বাঘটা চুপ করলো, অন্যগুলোও চুপ করলো; একটু পরে নিজের অজ্ঞান্তেই দেখলুম আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে, আর আমার সামনে এক

মেম-বৌদির কথা শুনে মনে হ'লো তাঁর দেশ ল্যাপল্যাণ্ড কি গ্রীনল্যাণ্ড। তারপর এই ল্যাপল্যাণ্ডবাসিনী বললেন—হ্যা, হুতুমগঞ্জে সাপের উৎপাত কিছু আছে। ভাবতে পারো, একটা সাপ একবার আমাদের হিটলারকে কামড়াতে এসেছিলো।

—হিটলার কে? আমি চমকে উঠলুম।

—মুসোলিনিকে তো দেখলে, ওরই জুড়ি হচ্ছে হিটলার। জার্মান উলফ্-হাউণ্ড। ওঃ, স্প্লেনডিড ডগ্। ভয়ে ভয়ে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে বললুম কোথায় সে?

—তাকে সেদিন হাসপাতালে পাঠিয়েছি, শরীর ভালো যাচ্ছেনা। যা গরম! মুসোকে দেখেই তুমি এত ঘাবড়ে গেছলে; হিট্‌কে দেখ্‌লে না জানি কী করতে!

মেম-বৌদি খিলখিল করে হেসে উঠলেন।

—হিট্ বুঝি আরো ভয়ানক?

—দেখতে অবিশ্যি মুসোর মতো জাঁদরেল নয়—হাউণ্ড জাতের কিনা, রোগা লিকলিকে শরীর। কিন্তু তেজীয়ান জানোয়ার যদি দেখতে চাও—একেবারে এ-ওয়ান! হুতুমগঞ্জে একটা লোক চাঁদার খাতা হাতে নিয়ে আসছিলো—তাকে ক্যাঁক ক'রে কামড়েই ধরলে পায়ে।

—বলো কী! আমি শিউরে উঠলুম।

মেম-বৌদি হেসে বললেন—হ্যাঁ, বই-খাতা দেখলেই হিট্-এর মাথা খারাপ হয়ে যায়, চোখ গোল হ'য়ে ওঠে, মুখ দিয়ে ফেনা গড়াতে থাকে। এমনকি, তোমার দাদা যখন বই পড়েন, তখন ও তাঁরও কাছে ঘেঁষে না, দূরে দাঁড়িয়ে গোঁ-গোঁ করতে থাকে। আমি একদিন একটা বই পড়ছিলুম, সেই রাগে ও আমার সাড়িটাই টুকরো টুকরো ক'রে ছিঁড়ে দিলে। সেই থেকে আমি বই-টই পড়া ছেড়েই দিয়েছি।

সুখী রাজপুত্র

আমি বললুম—তারপর সেই লোকটার কি হ'ল?

—কোন লোকটা?

—চাঁদার খাতা নিয়ে যে আসছিলো?

—কী আর হবে! দশটা টাকাই চাঁদা দিতে হ'লো আরকি। বলো কেন, কুকুর পোষবার ঝকমারিও আছে।

—তারপর লোকটার কিছু হয়নি তো? হাইড্রোফোবিয়া কি...

—কই, তা তো কিছু শুনিনি। তা আজকালকার দিনে একেবারে বোকা না হ'লে আর হাইড্রোফোবিয়া হবে কেন? গোটা কয়েক ইঞ্জেকশন নিলেই হয়।

—হুতুমগঞ্জে কি ও-সব ইঞ্জেকশন হয়?

—তা তো জানিনে। কামড়ে ধরলো যখন তখন লোকটার মুখ যদি দেখতে! মেম-বৌদি মৃদু হাসলেন। ওঃ, হিট ভারি বদমাস। তার উপর এখন এই ভাদ্রমাসে কুকুরদের একটু মাথা খারাপ হয়ই। এত গরম কি এ-সব ভালো-ভালো কুকুর সইতে পারে? মুসো তোমাকে কিছু করেনি তো?

ফ্যাকাশে মুখে যতটা সম্ভব হাসি টেনে এনে আমি বললুম—না শুধু একটু ঘেউ-ঘেউ করেছিল। তা হিট্-এর কি খুব অসুখ? বাঁচবে তো?

বৌদি অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে গিয়ে বললেন—কী যে বলো। হিট্ সামনের সোমবারই বাড়ি ফিরবে। আর একদিন এসো, ওর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব। হিট্ আর মুসো—ওরা বদরাগি বটে, কিন্তু ভাব ক'রে ফেলতে পারলে ভারি ভালো। দু'চারদিন ওদের সঙ্গে একটু খেলা করলে হয়। কী করলে খুব শিগগির ভাব হয় জানো? বই ছিঁড়তে ওরা দু'জনেই খুব ভালোবাসে। ধরো, বেশ ভালো বাঁধানো খানকয়েক ভালো-ভালো বই এনে দিলে—তখন দেখবে ওদের ফুর্তি। বইগুলোকে টুকরো-টুকরো করেই তোমার হাত চাটতে আসবে। তোমার কাপড়ও হয়তো খানকয়েক ছিঁড়বে···তা অত ভাবলে কি আর চলে? এসো দেখবে নাকি আমার কেনেল?

সুখী রাজপুত্র

—আমি বললুম, এখনই…?

—এসো না। বৌদি ওঠবার ভঙ্গি করলেন।

কিন্তু আমার কপালগুণে তক্ষুনি বাইরে একটা গাড়ী থামলো, আর একটু পরেই স্বয়ং আমার সিবিলিয়ান দাদা ঘরের মধ্যে এসে ঢুকলেন। তাঁর পরনে ঠিক সেই জিনিষ, আমরা যাকে হাফ-প্যান্ট বলি আর সাহেবরা যাকে বলে—শর্টস। গায়ে একটা হাত-কাটা শার্ট, মুখে পাইপ।

মুখ থেকে পাইপ না-নামিয়েই দাদা বললেন—এই যে রণেন। কেমন আছিস?

আমি বোকার মতো ব'লে ফেললুম—দাদা, তুমি ঐ বেশেই অফিসে গিয়েছিলে নাকি?

দাদা গম্ভীরভাবে বললেন—ট্রপিকস্-এ এই তো পরতে হয়। ব'লে অন্তর্হিত হ'লেন ভিতরে। খানিক পরে ফিরে এলেন সাদা পাৎলুন, সাদা ক্যানভাসের জুতো প'রে, আর গায়ে একটা সবুজ রঙের চেনটানা গেঞ্জি।

চেন-টানা গেঞ্জিটা দেখে একটা কথা ফস্ করে আমার মুখে উঠে আসছিলো, কিন্তু চেপে গেলুম। কে জানে ট্রপিকস্-এ হয়তো এ-ই পরতে হয়।

তারপর চা-পর্ব্ব। দুঃখের কথা আর বলবো কী—অত সব ভালো-ভালো খাবার, কিছুই তার খেতে পারলুম না। মেম-বৌদির সখ, বিকেলের চায়ের সময় সবগুলো কুকুর ছেড়ে দেয়া হবে। সবসুদ্ধ বারোটা। গুণতে হয় তো আমার ভুল হয়েছিল, কিন্তু বারোটা না হ'য়ে এগারোটা কি বারোটা হ'লে খুব কি কিছু এসে যায়? প্রকাণ্ড মুসো থেকে সুরু ক'রে অতি ক্ষুদে পুতুলের মতো বাচ্চা কুকুর পর্য্যন্ত নানা রঙের ও ছাঁদের, নানা নামের ও ডাকের কুকুরে প্রকাণ্ড ঘরটা ভর্ত্তি। তবু তো, সব চেয়ে বড়ো নাম-ডাক যার সেই হিট্-ই অনুপস্থিত। দাদা বৌদি দু'জনেরই হিট্-এর জন্য বেশ মন-খারাপ দেখা গেলো।

আমার পক্ষে অবশ্য বারোটাই যথেষ্ট। সে যা দৃশ্য দেখলুম জীবনেও ভুলবো না। কেউ বৌদির কোলে উঠে বসছে, কেউ একেবারে টেবিলের উপরেই আসীন; দাদার পায়ের তলায় গোটা দুই, তাঁর চেয়ারের আর্দ্ধেক দখল ক'রে একজন, একটা ক্ষুদে জাতীয় কুকুর চেয়ার বেয়ে তাঁর মাথার উপরেই চ'ড়ে বসলো দেখলুম। দাদা হয়তো একবার বললেন—Oh naughty Monty! কি মেম-বৌদি মৃদুহাতে একটার কান ম'লে দিয়ে হাসলেন; তাতে অবশ্য আরো বেশী উৎসাহ পেয়ে ওরা কেউ ডিগবাজি খেয়ে চায়ের পেয়ালাটাই উল্টে দিলে। শুধু মুসোলিনিকেই মনে হ'লো গম্ভীর, এ-সব ছেলে-খেলায় তার মন নেই; মুখের রীতিমতো একটা কটমটে ভাব ক'রে সে চুপ ক'রে এককোণে ব'সে রইলো; মাঝে একবার আড়চোখে আমার দিকে তাকালো সঙ্গে সঙ্গে আমি গলায় কেক ঠেকে বিষম খেয়ে মরি আরকি।

মেম-বৌদি যথেষ্ট ভদ্রতা ক'রে বললেন—কী হ'লো?

আমি তাড়াতাড়ি দু' ঢোঁক চা খেয়ে বললুম—কিছু না। তোমার কুকুরগুলো বেশ, মেম-বৌদি।

সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মুখ-চোখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো। বুঝতে পারলুম, কেক খেতে গিয়ে বিষম খাওয়া সত্ত্বেও আমার উপর তাঁর শ্রদ্ধা অনেক বেড়ে গেছে। মধুর হেসে বললেন—তুমি খুব কুকুর ভালোবাসো, না?

চারদিকে তাকিয়ে বললুম—তা-হ্যাঁ-তা-ভালোবাসি বইকি।

মেম-বৌদি উচ্ছ্বসিত স্বরে বললেন—Dogs are wonderful! তুমি এয়ারডেল ভালোবাসো না, অ্যালসেশিয়ন?

আমি সেই মুহূর্তে একখানা স্যাণ্ডউইচ তুলে মুখে ভরছিলুম, হঠাৎ আমার হাতে একটা আঁচড় লাগলো, আর সঙ্গে-সঙ্গে স্যাণ্ডউইচখানা অন্তর্হিত হ'লো!

মেম-বৌদি হাসতে হাসতে বললেন—Poppy! you naughty boy! পপিটা বড্ড স্যাণ্ডউইচ খেতে ভালোবাসে; ছাড়া থাকলেই চুরি করে। পমিরেনিয়ান তোমার ভালো লাগে না? কী সুন্দর ছোট্ট পুতুলের মতো। না কি তুমি সীলাম পছন্দ করো?

Poppy! you naughty boy! পপিটা বড্ড স্যাণ্ডউইচ খেতে ভালোবাসে।

ততক্ষণে আমার চেয়ারের চার-দিকে চার-পাঁচ-জন জড়ো হয়েছে, কেউ আঁচড়াচ্ছে, কেউ কোলে উঠতে চেষ্টা করছে, কেউ বা দু'পায়ে সোজা দাঁড়িয়ে কুঁই-কুঁই করছে। মেম-বৌদি ব'লে উঠলেন Look, look at Spots! The clever beggar! কিছু দাও ওকে রণেন। দেখছো না, তোমার কাছে খেতে চাইছে!

কিছু দাও ওকে রণেন। দেখছো না তোমার কাছে খেতে চাইছে !

একখানা স্যাণ্ডউইচ দিলুম ওকে ; তারপর আর একখানা, তারপর আরো একখানা।

ইতিমধ্যে দেখি, আর একজন আমার কোলে চ'ড়ে বসেছে। আমি কিছু ভীত স্বরেই বললুম—বৌদি ; ওকে ডাকো।

—ভয় নেই, কিচ্ছু ভয় নেই, ও একেবারে ভেড়ার মতো ঠাণ্ডা। একটু আদর করো না ওকে।

অগত্যা কোলে আসীন সারমেয়টার একটুখানি গায়ে হাত বুলোলাম। তারই ফলে কিনা জানিনে, হঠাৎ ও এক প্রচণ্ড লাফ দিয়ে মেঝেতে গিয়ে ছিটকে পড়লো, ওর নখের আঁচড়ে আমার পাঞ্জাবির খানিকটা ছিঁড়ে গেলো।

মেম-বৌদি ব'লে উঠলেন—ইঁদুর! নিশ্চয়ই ইঁদুর দেখেছে। বাব্বাঃ, ইঁদুর দেখলে জ্যাকির আর রক্ষে নেই। খুন চেপে যায়।···তুমি কিছু খাচ্ছো না যে?

—ওঃ, ঢের খেয়েছি, কত আর খাবো?

স্যাণ্ডউইচ খাও? না কি হ্যাম সম্বন্ধে কোনো প্রেজুডিস···

—না, না, সে-সব কিছু নয় ; এখন আর কিছু খাবো না।

দাদা বললেন—আজ ওয়েদার ভালো আছে ; একটু টেনিস খেললে হয়। তুমি খেলো নাকি রণেন?

কলেজে আমি একজন নাম-করা খেলোয়াড়, কিন্তু সে-কথা চেপে গিয়ে বললুম—না, আমি এখন উঠি।

দাদা বললেন—আমাদের ইয়ং মেন মোটে খেলে না। কেবল পড়া আর পড়া। এ জন্যেই তো আমাদের দেশের কিছু হচ্ছে না।

—হিটলারকে লেলিয়ে দাও দাদা, তাহ'লে সব পড়া বন্ধ হ'য়ে যাবে।—ব'লে আমি উঠলুম।

বৌদি বললেন—শিগগির আর একদিন এসো কিন্তু। হিটু-এর সঙ্গে আলাপ করবে। ডার্লিং হিট!

সেই যে দাদার বাড়ি থেকে প্রাণ নিয়ে বেরোলুম, বলা বাহুল্য সে-রাস্তা আর মাড়াইনি।

বিম্বি

বিম্বি
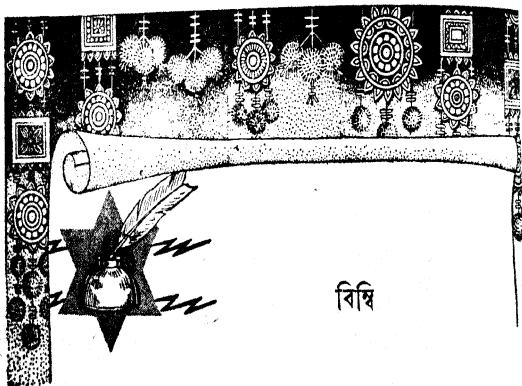
বিম্বির আর জঙ্গলে মন টেকে না।

সিঙ্গি-ছোঁড়ারা ওর সঙ্গে কথাই বলে না—ওরা বড় ঘরের ছেলে, ভারি নাক-উঁচু। আর বাঘের বাচ্চারা হালুম-হালুম ক'রে এমন দাপাদাপি হই-হুল্লোড় ক'রে বেড়ায়, যেন সমস্ত জঙ্গলটাই ওদের। বিম্বির সেটা সইবে কেন, বল? ও-ও তো কম নয়; ওদের ঘর হ'ল ভালুকদের মধ্যে সেরা; বাপ ওর ছোট-নাগপুরের কুলীন, আর ওর মা খাস রঙ্গলি-জঙ্গলের মেয়ে। সিংহ হ'লে তবু একটা বুঝি—বাঘ, ছোঃ! নেকড়েও বাঘ, চিতাও বাঘ—ওদের আবার জাতের বড়াই কি!

বনের মধ্যে বিম্বির ভারি একা-একা লাগে।

একদিন সে তার মাকে বল্‌লে, 'উঃ, আর পারিনে মা। একদিন যাবো আমি চ'লে এই জঙ্গল ছেড়ে।'

মা বল্‌লেন, 'কোথায় যাবি?'

'পৃথিবীতে জায়গার অভাব নাকি?

মা বল্‌লেন, 'কী যে বলিস! এই জঙ্গলেই কি জায়গার অভাব! জঙ্গলটা কত বড় জানিস? প্রা—য় পৃথিবীটারই সমান। তুই ভারি বোকা!'

বাবা গম্ভীরভাবে বল্‌লেন, 'পৃথিবীতে এর চাইতে বড় জায়গা হয়তো আছে, কিন্তু এর চাইতে ভালো জায়গা কক্ষনো নেই।' বাবা ছেলেবেলায় ইস্কুলে গিয়েছিলেন, মা-র চাইতে তাঁর বিদ্যা, বুদ্ধি ও জ্ঞান সবই ঢের বেশি। মাকে তার মা ছেলেবেলায় শুধু রাঁধতে আর বাসন মাজতে শিখিয়েছিলেন কিনা!

মা যা-ই ভাবুন, আর বাবা যা-ই বলুন বিম্বির আর মন টিকছে না এখানে। বাবা নিয়ে আসেন কোত্থেকে মস্ত মস্ত মাংসের ফালি, টকটকে লাল, দেখলেই ক্ষিদে পায়, আর আনেন পয়লা নম্বরি টাটকা তাজা মধু; এদিকে মা রান্না করেন, ঘর ঝাঁট দেন, বাসন ধুয়ে রাখেন—কাজে-কাজেই বিম্বির আর করবার থাকলো কী? ভল্লু-পল্লীতে তাদের বাড়িই সব চেয়ে সুন্দর—ছোটো বাড়ি অবিশ্যি, কিন্তু এমন ছোটোখাটো ঝকঝকে ফিটফাট বাড়ি সারা জঙ্গলেও বুঝি আর নেই। বাড়ির দরজায় ছোটো-ছোটো লাল অক্ষরে লেখা 'তিন ভালুক'; বিকেল বেলায় মোটাসোটা থল্‌থলে ভালুক-গিন্নীরা বেড়াতে এসে অবাক্ হ'য়ে বলেন, 'সত্যি ভাই হিড়িম্বি, কী ক'রে তুই এত পারিস্!' হিড়িম্বি, হ'ল গিয়ে বিম্বির মা-র ছেলেবেলাকার ডাক নাম, ভালো নাম হ'ল মধুরসনা। মধুরসনা ছেলেবেলায় ইস্কুলে পড়েন নি বটে, কিন্তু বিয়ের আগে কিছুদিন এক য়্যারিস্টোক্র্যাটিক মেয়ে-স্কুলে হাউস্‌কিপিং-এর লেসন্‌স্ নিয়েছিলেন—বাড়ি ঘর তাই তাঁর অত ঝক্‌ঝকে।

কিন্তু বিম্বি বেচারার আর সময় কাটে না। ঘুমিয়ে, হাই তুলে, গড়াগড়ি দিয়ে, মুখ ভেংচিয়ে কত আর ভালো লাগে বলো! এক্সারসাইজের অভাবে সে মোটা হ'য়ে যেতে লাগলো, এমনি কি। হায় রে, এত বড় জঙ্গলে একজন বন্ধু কি তার জোটে না? ফুর্তিবাজ, হাসিখুসি, কালোকেলো থোলোথেলো একজন

বন্ধু পেলে তার আর ভাবনা ছিলো কী! তা তো নয়, ঐ মিরকুট্টে শয়তান নেকড়ের বাচ্চারা রোজ তাদের বাড়ির দরজায় এসে কাঁই-কাঁই করবে—দু' একটা বাছা-বাছা হাড় যদি জুটে যায় কপালে। যেমন রোগা বিচ্ছিরি, কুত্তার মতো ওরা দেখতে, স্বভাবটাও তেমনি ওদের কুত্তারই মতো। উঃ!

'নাঃ, এখান থেকে আমাকে পালাতেই হবে', বিম্বি মনে-মনে বল্‌লো। 'বাবা-মা জানবেনও না।'

তার পর একদিন সত্যি-সত্যি সে বেরিয়ে পড়লো বাড়ি থেকে। তখন দুপুর বেলা, বেজায় গরম। মা-বাবা বড় বটগাছটার ছায়ায় শুয়ে ঝিরঝিরে হাওয়ায় দিব্যি ঘুমুচ্ছেন। পেছন দিকে মোটে ফিরে তাকালো না বিম্বি, খুব তাড়াতাড়ি হেঁটে চললো। জঙ্গলে তখন দ্বৈপ্রহরিক ঘুমের সময়, সকলেই প্রায় ঘুমুচ্ছে। কেউ তাকে দেখলো না। শুধু বানরদের একটা মেয়ে তেঁতুল গাছের সব চেয়ে উঁচু ডালে ব'সে আয়না সামনে রেখে চুল বাঁধছিলো, সে একবার তাকে দেখলে—কিন্তু দেখেও তাকালে না। চুল বাঁধতেই বড্ড ব্যস্ত সে।

দুই

বিম্বি বনের বাইরে এসে পড়লো। এখন আর অত তাড়াতাড়ি চলবার দরকার নেই; আস্তে-আস্তে হেলে-দুলে চলতে-চলতে এদিক্-ওদিক্ তাকাতে লাগলো সে। যত দেখে, ততই অবাক্ হয়। 'আরে, এ কী কাণ্ড! এ যে ম—স্ত পৃথিবী দেখছি।' যতই সে যাচ্ছে, ততই দেখছে মাঠের পরে মাঠ, পুকুরের পরে পুকুর, খাল আর ঝিল, আর নীল রঙের পাহাড়ের সারি কত অদ্ভুত চেহারায় বাঁকানো দুমড়ানো। কিছুরই যেন শেষ নেই!

'আরে সর্ব্বনাশ!' বিম্বির দস্তুর মতো হাঁপ ধ'রে গেলো! 'পৃথিবীটা কত

রকমের কত জিনিসে ভরা !'

দেখতে-দেখতে, অবাক্ হ'তে হ'তে হাঁপাতে-হাঁপাতে চললো সে, তার পর দিন যখন শেষ হয়-হয়, ছোট্ট একটা সহরে এসে হাজির। ক্ষিদে তার পেয়েছে অনেকক্ষণ, কিন্তু এতক্ষণে ক্ষিদেটা সে টের পেলো। কোন্ সকালে এক ভাঁড় মধু খেয়েছিলো, তার পর কিচ্ছু খায় নি।

সহরের একটা রাস্তায় ঢুকে প'ড়ে সে দেখলো, উল্টো দিক্ থেকে একটা মানুষ হেঁটে আসছে, মাথায় তার মস্ত ঝুড়ি। 'একে জিজ্ঞেস করি বাজারের রাস্তা কোন দিকে,' ভাবলে বিম্বি। 'কিছু খাবার কিনতে হবে তো।' না, সঙ্গে টাকা আনতে সে ভোলেনি। তার মুখের মধ্যে, জিভের তলায় আস্ত তিনটে রূপোর টাকা ঝক্‌ঝক্ করছে। টাকা না নিয়ে পথে বেরোবে, এমন ছেলেই সে নয়। বিম্বিকে তোমরা বোকা ঠাউরেছ নাকি !

কিন্তু যেই লোকটা তার কাছে এলো অমনি—এ কী কাণ্ড !—খ্যাক্‌শিয়ালির মতো সে গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো, দিলে ঝুড়ি ফেলে মাথা থেকে, তার পর বন্দুকের গুলির মতো ছুট্ !

বিম্বি মনে-মনে বল্লে, 'আরে, এ কী অবাক্ কাণ্ড। লোকটা অমন পালালো কেন ? ঝুড়িটাও ফেলে গেলো'। এই না ব'লে ঝুড়ির কাছে গিয়ে সে দেখলো—কী দেখলো ?—মস্ত একটা ভেড়া, আহা, কী সুন্দর, কী নধরকান্তি !—এইমাত্র মেরে চামড়া ছাড়ানো হয়েছে—দেখে বিম্বির আবেগে প্রায় চোখে জল এসে পড়লো। 'যাক্, ভালো কপাল ক'রে বেরিয়েছিলাম বাড়ি থেকে', ব'লে সে কাজে লেগে গেলো। খানিক পরে গোটা কয়েক শুকনো হাড় ছাড়া বাকি ভেড়াটা অদৃশ্য হ'য়ে গেলো বিম্বির পেটের মধ্যে।

'খাওয়াটা মন্দ হ'লো না, এবার একটু ঘুরে ফিরে সহরটা দেখা যাক্,' এই ব'লে বিম্বি এ-রাস্তা থেকে ও-রাস্তায়, আবার ও-রাস্তা থেকে সে-রাস্তায় বেড়াতে লাগলো। কিন্তু দূর থেকে যেই না তাকে দেখা, মানুষগুলো পাগলের মতো

'এই যে!' বিম্বি গলা খাঁকারি দিয়ে বললে, 'তুমি হবে নাকি আমার বন্ধু?'

চীৎকার ক'রে ঊর্দ্ধশ্বাসে দে-ছুট! দেখতে-দেখতে ছোট্ট সহরটির ঘরে-ঘরে দরজায় পড়লো খিল, রাস্তায় একটা প্রাণী নেই, একটা কুকুর পর্য্যন্ত নেই। চারদিক্ চুপচাপ, থমথমে, অন্ধকার।

তিন

'এ তো দেখছি মুস্কিলেই পড়া গেলো', বিম্বি মনে-মনে বল্‌লে। 'আমি এলুম ওদের সঙ্গে ভাব করতে, আর ওরা কিনা আমাকে দেখেই পালাচ্ছে! ভয় পায় নি তো আমাকে দেখে? এখানকার লোকরা দেখছি বড্ড শীগ্‌গির-শীগ্‌গির শুতে যায়। এমন করলে কার সঙ্গেই বা আমি ভাব করবো! যাক্ গে, আজ রাত্তিরটা তো কোনখানে শুয়ে থাকি, কাল সকালে আবার দেখা যাবে।'

মন খারাপ করে সহর ছাড়িয়ে মাঠের দিকে সে চল্‌লো। এখন, সহর যেখানে মাঠে মিশেছে, সেখানে দেখা গেলো ছোট্ট ফিটফাট একটি বাড়ি, আর সেই বাড়ির জানালায় দেখা গেলো আলো।

'যাক্, তবু একজন পাওয়া গেলো যে জেগে আছে। দেখে আসি একটু উঁকি দিয়ে।'

জানলায় উঁকি দিয়ে সে দেখলো ছোট্ট একটি ফুটফুটে ছেলে টেবিলের ধারে ব'সে; টেবিলে জ্বলছে আলো, আর টেবিলের উপর মস্ত একটা বই ছেলেটির সামনে খোলা।

'এই যে!' বিম্বি গলা-খাঁকারি দিয়ে বল্‌লে, 'তুমি হবে নাকি আমার বন্ধু?'

ছেলেটি বই থেকে চোখ তুলে বললে, 'কে তুমি?'

'আমি বিম্বি—ছোট্ট ভালুক। ভিতরে আসতে পারি?'

দ্রুতবেগে বাড়তে লাগলো। অনেকগুলো আনি জমে-জমে বেশ কিছু টাকা যখন হ'ল, তখন তাঁরা বিম্বিকে চকচকে ঝকঝকে একটা সায়েবি পোষাকের স্যুট তৈরি করিয়ে দিলেন—মায় টুপি-ছড়ি সুদ্ধ। এটাও বলতে হয় যে সে-সব কাপড়চোপড় তৈরী করাতে বেশ কিছু টাকাই খরচ হয়েছিলো, কেননা বিম্বি ততদিনে আর ছোট্ট ভালুকটি নেই, দস্তুর মতো বড়োসড়ো জাঁদরেল পালোয়ান ভালুক হ'য়ে উঠেছে।

বাড়ি চাই, বাড়ি !

বাড়ি চাই, বাড়ি!
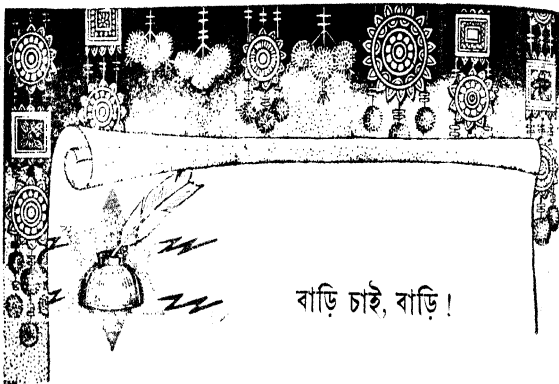
না:, আর পারি নে। সেই সকালবেলা বেরিয়েছি, এখন বেলা বাজে একটা। খিদেয় নাড়ী-ভুঁড়ি ছিঁড়ে যাচ্ছে। আর কী রোদ—বাপ্‌স্! হাঁটতে-হাঁটতে পা দুটো বোধ হয় ইঞ্চিখানেক ছোট হ'য়ে গেছে! দেখি।... নাঃ, ঠিকই তো আছে মনে হচ্ছে। এবারে ফিরে যাই। নাকি আর একটু দেখবো? এই একটা নতুন রাস্তা মনে হচ্ছে। কী নাম রাস্তার? রাজা রাজেন্দ্র রোড। ও-হো, নামের কী ছিরি! একেবারে রাজ-রাজড়ার বাজার বসিয়েছে যেন! যাক গে, এত দূরে এলুম যখন, এখানেও ঢুঁ মেরে যাই। কে জানে কোথায় কার কপাল খোলে? হয়তো আর দু'পা হাঁটলেই ঠিক মনের মত···উঃ! এই একমাস ধ'রে রাস্তার কুকুরের মত পথে-পথে বেড়াচ্ছি, সোজা রাস্তায় হাঁটলে এতক্ষণে বোধ হয় পৃথিবী চক্কোর দিয়ে আসতে পারতুম। বাড়িও তো কম দেখলুম না—ছোট বাড়ি, বড় বাড়ি, সাদা বাড়ি, হলদে বাড়ি, লাল বাড়ি,

ঝকঝকে বাড়ি, নড়বড়ে বাড়ি, স্যাঁৎসেঁতে বাড়ি, ম্যাটমেটে বাড়ি, ঝাঁঝরা পাঁজরা-দেখানো, মুখ-ভ্যাংচানো, আনকোরা রঙ-করা, ফ্যাশানওয়ালা, শান-পালিশ-বার্নিশ-কার্নিশে কেষ্ট-বিষ্টু, অতি-পুরুষ্টু, বাড়ি···বাড়ি তো সবশুদ্ধ কম দেখলুম না, কিন্তু ঠিক আমার থাকবার মত বাড়ি একটাও নেই। তা হ'লেও, বাড়ি একটা না-হ'লেই বা চলবে কি ক'রে? বাড়ি যদি পাওয়া না-ই যায় তবে আমি থাকবো কোথায়? থাকতে তো আমাকে হবেই। মশাই, বিশ্বাস না হয় না করবেন, কিন্তু কোনখানে আমাকে থাকতেই হবে, এ হচ্ছে খাঁটি সত্যি কথা। এক কাজ করা যাক্। টালিগঞ্জ কি টিটাগড়, বেহালা কি চেৎলা, যাদবপুর কি ব্যারাকপুর কোনওখানে বেশ ভালো দেখে একটা মস্ত গাছে চ'ড়ে বসা যাক্—হাঃ-হাঃ, ভাড়া লাগবে না অর্দ্ধ-পয়সা, দিব্যি সুখে দিন-গুজরান! কিন্তু কর্পোরেশনের লোক যদি হানা দেয়—বলে ট্যাক্সো দাও! বলবো, স'রে পড়, গাছে যে থাকে তার আবার ট্যাক্সো কি? পাখী কি ট্যাক্সো দেয়? বাঁদর কি ট্যাক্সো দেয়? ভীমরুল, জামরুল, বোলতা, নিমপাতা, কাঁঠাল, মাকাল, কঙ্কাল—এরা কি ট্যাক্সো দেয়? অবশ্যি কঙ্কাল ট্যাক্সোও দেয় না, গাছেও থাকে না; হাঃ হাঃ!

[পরিপাটি চুল, চোখে চশমা, ধব্‌ধবে ফিনফিনে জামা-কাপড় পরা এক যুবক সেই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে।]

যুবক। মশাই, মাপ করবেন, আপনি এইমাত্র হাসছিলেন কেন?

সুখেন্দু (ধরা যাক্ তার নাম সুখেন্দু)। হাসছিলাম নাকি?

যুবক। বিড়বিড় ক'রে কথাও বলছিলেন যে! বাঃ, জানেন না! চমৎকার—ঠিক হয়েছে। আপনারটা হচ্ছে 'ইগো-কমপ্লেক্স', এ রকম কেস্ প্রায়ই দেখা যায়···

সুখেন্দু। কি বললেন মশাই, কী হয়েছে? আমার কোন অসুখ করেছে নাকি?

যুবক। অসুখ আপনার করেছে, অবিশ্যি আপনি তা জানেন না। যখন সেরে যাবে তখন জানবেন। আমার চেম্বারে আসবেন—০০১ নম্বর জনক

সিং রোডে—ভয় নেই আপনার, ফি লাগবে না।

সুখেন্দু। হঠাৎ আবার কী অসুখ করলো আমার! একটু বলবেন? (হাত বাড়িয়ে দিলে।)

যুবক (মৃদুহাস্যে)। থ্যাঙ্কিউ, নাড়ী দেখতে হবে না। আপনার অসুখ আপনাকে যেদিন বলতে পারবো সেদিন তো আপনি সেরেই যাবেন। ভয় নেই, এ অসুখে কেউ মরে না।

সুখেন্দু। খুব শক্ত ব্যামো নাকি?

যুবক (পিঠ-চাপড়ানো ভাবে) আমার চেম্বারে আসবেন, সব ঠিক হ'য়ে যাবে। একটু দাঁড়ান, আমার নোট-বইয়ে টুকে নিই। মশায়ের নাম?

সুখেন্দু। আজ্ঞে?

যুবক। আপনার নামটা একটু বলবেন।

সুখেন্দু (মনে-মনে)। ওরে বাবা, নাম টুকে নিতে চায় কেন, পুলিশের লোক নয় তো! সারাদিন পথে-পথে ঘুরি, তাইতে নজর পড়েছে। কী করি এখন? নাম ভাঁড়াবো? না, না, তা হ'লে আরো হয়তো বিপদে পড়বো। হায় হায়, বাড়ি খুঁজতে-খুঁজতে শেষটায় কি শ্রীঘরে যাবো?

যুবক। আপনার নামটা...

সুখেন্দু। আজ্ঞে কিছুতেই মনে আনতে পারছি না।

যুবক। ঠিক! ঠিক! ঠিক মিলে যাচ্ছে। লোকাল য়্যাট্রফি অব মেমরি। খুব ইন্টরেস্টিং কেস্ মনে হচ্ছে আপনার। তা আপনি এক কাজ করবেন—কাল সকালে ন'টার সময় ঠিক এই রাস্তার মোড়ে এসে দাঁড়িয়ে থাকবেন, আমি এসে আপনাকে চেম্বারে নিয়ে যাবো। মনে থাকবে তো ঠিক? আমারটা হচ্ছে মশাই পিওর লভ্ অব সায়ান্স—ঠিক আসবেন কিন্তু। [প্রস্থান]

সুখেন্দু। বাঁচা গেলো বাবা! কে না কে, পথের মধ্যে ধ'রে উৎপাত! ব্যামো হয়েছে না হাতী! নিশ্চয়ই পুলিশের লোক। যাক্ গে, এ রাস্তাটা

তাড়াতাড়ি সেরে যাই। রাস্তাটা সুন্দর তো? তা এখানে কি আর বাড়ি খালি আছে! গোঁফওয়ালা, গোঁফ-কামানো, মোটা, রোগা, লম্বা, বেঁটে, কিপ্‌টে টাম্বুস রিটায়ার্ড সবজজ, মাজিস্ট্রর, পেশ্‌কার, মাষ্টার, যে যার মতো বাড়ি তুলে দিব্যি গ্যাঁট হ'য়ে বসেছেন। এখানে নাক ঢোকায় কার সাধ্যি! আরে আরে, এই যে একটা টু-লেট ঝুলছে দেখছি! হ্যাঁ, সত্যিই তো, ঐ তো স্পষ্ট বড়ো-বড়ো কালো অক্ষরে টু-লেট লেখা! বাড়িটার বাইরের চেহারা তা তো ভালোই মনে হচ্ছে। সমস্তটা বাড়ি নয় তো? না, না, ঐ তো দেখছি উপরে লোক রয়েছে। বোধ হয় নীচের তলাটা খালি। কি হয়তো উপরেরই দু'খানা ঘর। দেখি খোঁজ নিয়ে, এখানে যদি কপাল খোলে।

[একজন গোঁফওয়ালা মোটাসোটা লোক সেই বাড়িরই দরজা থেকে বেরিয়ে এলো।]

সুখেন্দু। দেখুন মশাই—

গোঁফওয়ালা। দেখেছি, মশাই, সবই দেখেছি। দেখেই বেরিয়ে এলুম। মশাই আপনি ভদ্রলোকের ছেলে, এটা কি আপনার উচিত?

সুখেন্দু। কী হয়েছে?

গোঁফওয়ালা। থাক্, আর ন্যাকা সাজতে হবে না। বলি, ভদ্দরলোকের বাড়ির দিকে অমন হাঁ করে তাকিয়ে থাকাটা কি ভালো?

সুখেন্দু। ও আপনারা থাকেন বুঝি দোতলায়? তা দেখুন, আমি বাড়ির খোঁজ করছি।

গোঁফওয়ালা। বাড়ির খোঁজে এখানে কেন? বড়বাজার আছে, রাধাবাজার আছে, পিপুলপটি, চিংড়িহাটা, বেলেঘাটা কত জায়গা আছে…এত জায়গা থাকতে আপনি যে ঠিক আমার বাড়ির সামনেই এসে দাঁড়িয়েছেন তার কারণটা কী শুনতে পাই?

সুখেন্দু। বাঃ, আপনার বাড়ির গায়ে টু-লেট লেখা রয়েছে দেখছেন না?

গোঁফওয়ালা। না মশাই, এখানে টুলেট-ফুলেট কিছু নেই, ভালো চান তো স'রে পড়ুন।

সুখেন্দু। মশাই, দয়া ক'রে একবার তাকিয়ে দেখুন। টু-লেট যখন রয়েছে বাড়ি নিশ্চয়ই খালি। সেইজন্যই তো তাকিয়ে দেখছিলাম।

গোঁফওয়ালা। হোঃ! ঐ যে জানলায় পরদা রয়েছে দেখছেন না? বারান্দা থেকে আমার শালীর তিনখানা সাড়ি ঝুলছে—দেখছেন না? এ সব দেখেও উঁকিঝুঁকি দেওয়ার কারণটা কী শুনি?

সুখেন্দু। দেখুন মশাই, সেই সকাল থেকে হণ্টনং হণ্টনং সহর চুড়নম্—এখন বেশি জ্বালাবেন না ব'লে দিচ্ছি। পারেন তো বাড়িওয়ালাকে ডেকে দিন।

গোঁফওয়ালা। বাড়িওয়ালার সঙ্গে কী দরকার আপনার?

সুখেন্দু। সে ভয়ানক রহস্যের কথা মশাই। আপনার মগজে ঢুকবে না।

গোঁফওয়ালা। বুঝেছি, আপনি বাড়ি খুঁজতে বেরিয়েছেন। হাঃ-হাঃ।

সুখেন্দু। ও, বুঝতে পেরেছেন সেটা! অসংখ্য ধন্যবাদ।

গোঁফওয়ালা। মশায়ের ক'খানা ঘর চাই?

সুখেন্দু। ও, আপনিই বাড়িওয়ালা বুঝি। নমস্কার। আপনার এই বাড়ির কোন্ অংশটা ভাড়া দেবেন?

গোঁফওয়ালা। ক'খানা ঘর চাই আপনার?

সুখেন্দু। তা, ধরুন খান তিনেক···

গোঁফওয়ালা। হুঁ···তিনখানা। মশায়ের কী করা হয়?

সুখেন্দু। আজ্ঞে আমি জগত্তারণ ইস্কুলে মাষ্টারি করি।

গোঁফওয়ালা। জগত্তারণ ইস্কুলটা আবার কোথায়?

সুখেন্দু। লেক্ রোডে।

গোঁফওয়ালা। লেক্ রোডে? তা হবে। কত ইস্কুল হচ্ছে আজকাল;

সুখেন্দু। তা আপনার বাড়ি··

গোঁফওয়ালা। মশাই বিবাহিত?

সুখেন্দু। আজ্ঞে?

গোঁফওয়ালা। বলি, বিবাহ করেছেন?

সুখেন্দু। আজ্ঞে না।

গোঁফওয়ালা। বিধবা মা আছেন।

সুখেন্দু। আছেন।

গোঁফওয়ালা। ভাই-বোন?

সুখেন্দু। একটি ভাই, একটি বোন।

গোঁফওয়ালা। বিধবা মাসি-পিসি···

সুখেন্দু। মশাই, অত খোঁজে আপনার দরকার কি? বাড়ি ভাড়া নিতে এসেছি, বাড়ি দেখাবেন—মাসি-পিসির খোঁজ দিয়ে আপনার কী হবে?

গোঁফওয়ালা। তা এক বছরের গ্যারান্টি দেবেন তো?

সুখেন্দু। মশাই, আপনার বাড়িই দেখলুম না তো অত কথায় কী হবে? বাড়িটা আগে দেখান, যদি পছন্দ হয়...

গোঁফওয়ালা। আর ভাড়াটি ঠিক পয়লা তারিখে চাই মশাই, নড়চড় না হয়।

সুখেন্দু। বাড়ি দেখাবেন কিনা বলুন, নয়তো...

গোঁফওয়ালা। একটু দাঁড়ান। (হাঁক দিয়ে) কেষ্ট, অ কেষ্ট, অরে কেষ্ট, হরেকেষ্ট! একতলার চাবিটা নিয়ে আয় তো রে!

সুখেন্দু। ও, একতলাটা বুঝি ভাড়া দেবেন?

গোঁফওয়ালা। হ্যাঁ, একতলাটা। তা আমার দোতলার চাইতে একতলাটাই ভালো।

সুখেন্দু। সে দেখলেই বুঝতে পারবো।

[প্রায় পনেরো মিনিট কেটে গেলো।]

সুখেন্দু। কই মশাই, আপনার কেষ্ট তো আসছে না! এদিক রোদ্দুরে তো মাথা ফেটে গেলো।

গোঁফওয়ালা। এই যে, ছায়ায় এসে দাঁড়ান। অ কেষ্ট, অরে কেষ্ট,

বড় ঘর চান তো ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়েলে-থাকলেই পারেন।

হরেকেষ্ট, রামকেষ্ট, প্রাণকেষ্ট !—ব্যাটা বোধহয় নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে এতক্ষণে !

সুখেন্দু। আর কাউকে ডাকুন না !

গোঁফওয়ালা ! মশাই, আমাকে কি নবাব-বাদশা পেয়েছেন যে দশটা চাকর রাখবো। . খেটে খাই মশাই, বাবুগিরির ধার ধারি নে।

সুখেন্দু। আহা—সে-কথা কে বলছে! আপনার বাড়িটা দেখাবেন তো দেখান—অত ঝামেলা করবার সময় নেই।

গোঁফওয়ালা। ও, দেখেই স'রে পড়বেন—কেমন না? আপনাকে বলবো কি মশাই, জ্বালাতন হ'য়ে গেলুম। বলি, সত্যি-সত্যি বাড়ি ভাড়া নেবেন তো ?

সুখেন্দু। তা নয় তো কি এই রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে আপনার সঙ্গে পরিহাস করছি ?

গোঁফওয়ালা। আর বলবেন না মশাই, রোজ সারাক্ষণ হাঁক-ডাক জ্বালাতন—বাড়ি দেখে-দেখে বাবুরা সব চ'লে যাচ্ছেন, তার পর কারো নাকের ডগাটি দেখবার উপায় নেই। ও-সব নবাবি আমার ধাতে সয় না বাপু।

সুখেন্দু (মনে-মনে)। গুঁফোটা তো আচ্ছা লোক দেখছি! বাড়ি দেখাবার নামটি নেই, খালি বকর-বকর ! (জোরে) থাক্ মশাই, আপনাকে আর বিরক্ত করবো না, আমি চললুম।

গোঁফওয়ালা। আহা—হা, রাগ করলেন নাকি? কেষ্টটা তো এলো না, আসুন আপনাকে এমনি দেখিয়ে দিই। এই জানলা দিয়ে তাকালেই বুঝতে পারবেন। এই যে আসুন, গলা উঁচু ক'রে দেখুন না—ঐ দেখছেন ঘর, পাশে আর একখানা, হ'লো দু'খানা। কি বললেন মশাই, ছোট ঘর? য়্যাঁ? মানুষের থাকবার ঘর তো ঐ রকমই হয়, বড় ঘর চান তো ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়েলে থাকলেই পারেন। কি বললেন, খুপরি? মশাই, আপনার সাহস তো খুব! জানেন স্যার গৌরীশঙ্করের পার্সনেল য়্যাসিস্ট্যান্ট আমার এ-বাড়িতে ছ'বছর থেকে

গেছে? অতি চমৎকার বাড়ি, মশাই—যেমন আলো-হাওয়া,—য়্যাঁ, কী বললেন? দক্ষিণ বন্ধ? তা মানুষ তো ও-রকম বাড়িতেই থাকে, খোলা চান তো গড়ের মাঠে থাকলেই পারেন। হ্যাঁ, রান্নাঘর আছে বই কি ও দিকে, রান্না, ভাঁড়ার সব আছে মশাই। কি বললেন, ঐ টিনের ছাপরা খারাপ হ'লো? ও, ঘরের মধ্যে দিনরাত উনুনের ধোঁয়া না হ'লে বুঝি ভালো লাগে না? সুন্দর টিনের রান্নাঘর ক'রে দিয়েছি, মশাই, ও-রকম আর কোথাও পাবেন না। আর ঐ কলতলাটা টিন দিয়ে ঘেরাও ক'রে নিলেই তো বাথরুম হ'য়ে গেলো, টিন না হয় আমিই দেব। কী সুন্দর বাড়ি দেখলেন তো? ভাড়া পঞ্চাশ টাকা—মাসের পয়লা তারিখেই দিতে হবে কিন্তু।···ও কী···কী হ'লো মশাই

আমি পাগল হ'য়ে যাবো, আমি পাগল হ'য়ে যাবো!

ও···মশাই শুনুন, শুনুন, আরে শুনেই যান না···

সুখেন্দু (রাস্তার মাঝখানে লাফাতে-লাফাতে) আমি পাগল হ'য়ে যাবো, আমি পাগল হ'য়ে যাবো!

সুখী রাজপুত্র
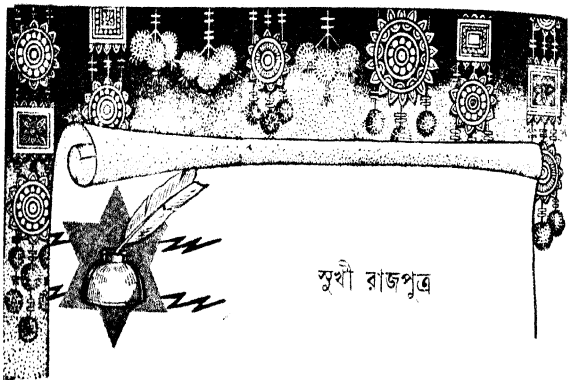
সহরের অনেক অনেক উঁচুতে, প্রকাণ্ড উঁচু থামের উপরে সুখী রাজপুত্রের মূর্তি। সমস্ত শরীর তার পাৎলা সোনার পাতে মোড়া, চোখ তার উজ্জল দুটি নীলা, আর তার তলোয়ারের হাতলে মস্ত একটা পান্না ঝলমল করছে।

সবাই তাকে খুব বাহবা দেয়। নগর পরিষদের একজন মন্ত্রী বলেন, 'বাঃ, কী সুন্দর!' তাঁর ইচ্ছে, সুন্দর জিনিসের সমঝদার হিসেবে তাঁর নাম হোক। তারপরেই তাড়াতাড়ি বলেন, 'তবে এ দিয়ে অবশ্য কোনো কাজ হয় না।' পাছে লোকে ভাবে তিনি কাজের লোক নন! মস্ত কাজের লোক তিনি।

ছোট্ট একটি ছেলে কেঁদে কেঁদে বলছিলো, 'আমাকে চাঁদ ধ'রে দাও, আমাকে চাঁদ পেড়ে দাও।' তার মা বিজ্ঞের মতো বলেন, 'ঐ সুখী রাজপুত্রের মতো হ'তে পারো না তুমি? সে তো কখনো কোনো জিনিসের জন্য কাঁদবার কথা মনেও আনে না।'

সুখী রাজপুত্র

আশা যার ব্যর্থ হয়েছে এমন একজন লোক ঐ আশ্চর্য্য মূর্ত্তির দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে মনে-মনে বলে: পৃথিবীতে কেউ যে একজন সুখী এ-কথা ভাবতেই ভালো।'

অনাথ-আশ্রমের ছেলেমেয়েরা বলে, 'ঠিক দেবদূতের মতো দেখতে।'

'কী ক'রে জানলে?' তাদের অঙ্কের মাষ্টারমশাই থমকে ওঠেন, 'দেবদূত দেখেছো কখনো?'

'দেখেছি বই কি, স্বপ্নে দেখেছি।'

কথাটা শুনে অঙ্কের মাষ্টারমশাই গম্ভীর হয়ে গেলেন, ছেলেমেয়েরা স্বপ্ন দেখুক, এটা মোটেও তাঁর পছন্দ নয়।

এক রাত্রে সেই সহরের উপর দিয়ে উড়ে গেলো ছোট্ট সোয়ালো পাখি। তার বন্ধুরা দেড় মাস আগে গেছে মিশরদেশে চলে, কিন্তু সে ছিলো পিছনে পড়ে, কারণ তার ইচ্ছে অতি সুন্দর ছিপছিপে একটি বেতকে বিয়ে করে। সেদিন মস্ত একটা হলদে ফড়িংকে তাড়া ক'রে ক'রে নদীর উপর দিয়ে সে যখন উড়ে যাচ্ছে সেই পাৎলা ছিপছিপে বেতকে দেখে তার এত ভালো লাগলো যে সে তক্ষুণি থেমে গেলো তার সঙ্গে আলাপ করতে।

'আমাকে বিয়ে করবে?' আসল কথাটা একেবারেই পাড়লে সোয়ালো পাখি, আর শ্রীমতী বেত মাথা নীচু করে নমস্কার করলে। সোয়ালো তাকে ঘিরে উড়ে উড়ে বেড়ালো, পাখার ডগা দিয়ে জল ছুঁয়ে-ছুঁয়ে, ছলছল রূপালি ঢেউ-তুলে। এমনি করে তাদের ভাব জমলো, এমনি করে কাটলো সমস্ত গ্রীষ্ম।

অন্যান্য সোয়ালোরা টিট্‌কিরি দিয়ে বললে, 'ওঃ ভা—রি বিয়ে হচ্ছে। মেয়ের তো এক পয়সা সম্বল নেই, তার উপর আত্মীয়ের গুষ্টি!' আর সত্যি, নদীটা ভরেই বেতের ঝোপ। তারপর শীত যখন পড়ি পড়ি করছে তারা সব উড়ে চললো।

ওরা তো গেলো চ'লে, এদিকে আমাদের সোয়ালোর বড়ো একা-একা

লাগছে! ভাবী স্ত্রীর সঙ্গেও আর সময় কাটে না। 'মোটে কথাই নেই ওর মুখে! বেশ সংসারী মেয়ে, তা ঠিক; কিন্তু আমি দেশ-বিদেশ বেড়াতে ভালবাসি, তাই আমার স্ত্রীরও বেড়াতে ভালো না বাসলে চলবে না।'

শেষ পর্য্যন্ত সে কাছে গিয়ে বললে, 'যাবে তুমি আমার সঙ্গে? কিন্তু শ্রীমতী বেত মাথা নাড়লেন, দেশের মাটির উপর এমনিই তাঁর টান।

বলে উঠলো সোয়ালো, 'তা'হলে তোমার সঙ্গে হ'লো না। চললুম আমি পিরামিডের দেশে।' গেল সে উড়ে।

সমস্ত দিন উড়লো সে, সন্ধ্যেবেলা এসে পৌঁছলো, সেই সহরে। 'রাতটা কোথায় কাটাই?' মনে-মনে সে বললে, 'এই সহর সব আয়োজন ক'রে রেখেছে আশা করি।'

তারপরে তার চোখে পড়লো উঁচু থামের উপর রাজপুত্রের মূর্ত্তি।

'ঐ তো আমার থাকবার জায়গা! সে চেঁচিয়ে উঠলো। 'জায়গাটি বড়ো সুন্দর তো—আর কী হাওয়া!'

এই না ব'লে সে নেমে পড়লো ঠিক সুখী রাজপুত্রের দু'পায়ের মাঝখানে।

'বাঃ' চারদিকে তাকিয়ে সে আস্তে বলে উঠলো, 'শোবার জন্যে সোনার ঘর পেয়েছি আমি।' ব'লে সে পাখার মধ্যে মাথা গুঁজে ঘুমুতে যাবে, এমন সময় বেশ বড়ো এক ফোঁটা জল তার গায়ে পড়লো। 'অবাক কাণ্ড!' সে বলে উঠলো, 'আকাশে এক ফোঁটা মেঘ নেই, তারাগুলো ঝকমক করছে, তবু কিনা বৃষ্টি! এই উত্তর ইউরোপের ক্লাইমেট সত্যি বড়ো বিশ্রী!'

তারপর আর এক ফোঁটা পড়লো।

'বৃষ্টিই যদি আটকাতে না পারে তবে একটা মূর্ত্তি থেকে লাভটা কী? নাঃ, ভালো দেখে একটা চিমনি খুঁজে নিতে হচ্ছে।' বলে সে সেখান থেকে উঠতে গেলো।

কিন্তু তার পাখা খুলতে না খুলতেই আরো এক ফোঁটা পড়লো তার

গায়ে, সঙ্গে-সঙ্গে উপরের দিকে তাকিয়ে সে দেখলো—চুপ, চুপ। কী দেখলো?

সুখী রাজপুত্রের দু'চোখ ভরা জল, তার সোনার গাল বেয়ে দরদর করে জল ঝরছে। চাঁদের আলোয় এমন সুন্দর তার মুখখানা যে ছোট্ট সোয়ালোর হৃদয় করুণায় ভ'রে গেলো।

'কে তুমি?' সে জিজ্ঞেস করলে।

'আমি সুখী রাজপুত্র।'

সুখী রাজপুত্রের দুচোখ ভরা জল, তার সোনার-গাল বেয়ে দরদর করে জল ঝরছে।

'তবে তুমি কাঁদছো কেন? আমাকে একেবারে ভিজিয়ে দিয়েছো যে!'

মূর্তি জবাব দিলে 'যখন বেঁচে ছিলুম, আর যখন আমার মানুষের হৃদয় ছিলো তখন কান্না কা'কে বলে আমি জানতুম না। কারণ আমি থাকতুম চিরসুখের প্রাসাদে, সেখানে দুঃখকে ঢুকতে দেয়া হ'ত না। দিনের বেলায় আমি সঙ্গীদের সঙ্গে খেলে বেড়াতুম; সন্ধ্যেবেলায় স্বর্ণ ভবনে আমি হতুম নৃত্যের নেতা। বাগান ঘিরে ছিলো মস্ত

উঁচু দেয়াল—তার ওপিঠে কী আছে আমি কখনো জিজ্ঞেস করিনি, কারণ আমার চারদিকে সবই ছিলো অতি সুন্দর। আমার পারিষদরা আমাকে বলতো সুখী রাজপুত্র—আর ফুর্তিতেই যদি সুখ হয় তবে সত্যি আমি সুখী ছিলুম। এমনি আমার জীবন কাটলো, এমনি আমার মৃত্যু হ'লো। আর এখনো মরে যাওয়ার পর, আমাকে ওরা এত উঁচুতেই বসিয়েছে যে আমি চারদিকে তাকিয়ে আমার নগরের সমস্ত কুশ্রীতা আর দারিদ্র্য দেখতে পাই; আর যদিও আমার হৃদয় এখন সিসের তৈরি, তবু না কেঁদে আমার উপায় থাকে না।'

'ও, তুমি তাহলে আগাগোড়া সাচ্চা সোনা নও!' সোয়ালো বললে। অবিশ্যি মনে মনে বললে, কেন না সে ভারি ভদ্র, কখনো কাউকে শুনিয়ে এ-রকম কোনো কথা বলে না।

মুখ তার রোগা ফ্যাকাশে, হাত দু'খানা দগদগে লাল, ছুঁচের খোঁচা খেয়ে খেয়ে···

এদিকে মূর্তি নিচু গলায় গানের মত গুণগুণ ক'রে বলতে লাগলো, 'অনেক দূরে এক ছোট্ট রাস্তায় আছে এক জীর্ণ বাড়ি। একটা জানলা তার খোলা, আর তার ভিতর দিয়ে দেখা যায় একটি মেয়ে টেবিলের ধারে বসে আছে। মুখ তার রোগা ফ্যাকাশে, হাত দু'খানা দগদগে লাল, ছুঁচের খোঁচা খেয়ে খেয়ে শক্ত হয়ে গেছে। সেলাই

করে তার দিন গুজরান হয়। রাণীর সখিদের মধ্যে সবচেয়ে যে সুন্দরী তার সাটিনের কাপড়ে সে বড়ো বড়ো সূর্যমুখী ফুল তুলছে রঙিন সুতো দিয়ে; রাজসভায় শিগ্‌গিরই যে-নাচ হবে তাতে তিনি সেটা পরবেন। ঘরের এক কোণে তার ছোট্ট ছেলে অসুখে পড়ে। ছেলেটির জ্বর হয়েছে, কমলালেবু খাবার জন্যে সে বায়না ধরেছে। নদীর জল ছাড়া আর কিছু তার মা দিতে পারছে না, সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। ওগো সোয়ালো, ওগো লক্ষ্মী ছোট্ট পাখি, তুমি আমার তলোয়ারের হাতল থেকে পান্নাটা তুলে নিয়ে সেই মেয়েকে দিয়ে এসো। আমার পা তো এখানে আটকানো, আমার নড়বার উপায় নেই।'

সোয়ালো বললে, "মিশরদেশ আমার জন্য অপেক্ষা করছে। নীল নদীর উপর দিয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে আমার বন্ধুরা, বড়ো বড়ো পদ্মফুলের সঙ্গে গল্প করছে। শিগ্‌গিরই ওরা ঘুমোতে যাবে মৃত মহারাজার স্তম্ভে, সেখানে স্বয়ং মহারাজ তাঁর ছবি-আঁকা কফিনে শুয়ে আছেন। গায়ে তাঁর হলুদ রঙের কাপড় জড়ানো, গায়ে তাঁর সুগন্ধি মশলা মাখা। গলায় তাঁর ফিকে সবুজ পাথরের মালা, হাত দু'খানা তাঁর শুক্‌নো পাতার মতো।'

'ওগো সোয়ালো, ওগো ছোট্ট পাখি, তুমি কি এক রাত্রি আমার কাছে থাক্‌বে না, তুমি কি যাবে না আমার দূত হয়ে? ছেলেটির বড় তেষ্টা পেয়েছে, তার মা-র কী কষ্ট!'

সোয়ালো জবাব দিলে, "ছোট্ট ছেলেদের আমি বিশেষ পছন্দ করিনে। গেলোবছরের গ্রীষ্মে আমি নদীর উপরে বাসা নিয়েছিলাম। সেখানকার কলওয়ালার দুটো অসভ্য ছেলে কেবলই আমাকে ঢিল ছুঁড়তো। অবিশ্যি তার একটাও আমার গায়ে লাগে নি, কারণ আমরা সোয়ালোরা হচ্ছি সেরা উড়িয়ে, তা' ছাড়া পাখা চালাবার ওস্তাদির জন্যে আমার বংশই নাম করা—তবু, গায়ে না লাগালেও অপমান তো বটে।'

কিন্তু সুখী রাজপুত্রকে এমন মনমরা দেখাচ্ছিলো যে সোয়ালোর মনে কষ্ট হ'লো। তাই সে বললে, "এখানে বড় ঠাণ্ডা, কিন্তু এক রাত্রি আমি তোমার কাছে থাকবো, হব তোমার দূত।"

"ছোট্ট সোয়ালো, তুমি বড়ো ভালো," বললে রাজপুত্র।

তারপর সোয়ালো রাজপুত্রের তলোয়ারের হাতল থেকে মস্ত পান্নাটা ঠুকরে তুলে নিলে, সেটা ঠোঁটে ক'রে উড়ে গেলো সহরের অনেক ছাদের উপর দিয়ে।

গেলো সে উড়ে গির্জ্জার উপর দিয়ে, শ্বেতপাথরের কত দেবদূতের মূর্ত্তি। গেলো সে প্রাসাদের ধার দিয়ে, শুনলো নাচ গানের শব্দ। সুন্দর একটি মেয়ে বেরিয়ে এলো বারান্দায় তার স্বামীর সঙ্গে—স্বামী বললে, "দ্যাখো, দ্যাখো কী সুন্দর তারা।"

মেয়েটি জবাব দিলে, "রাজসভায় নাচের দিনে আমার নতুন কাপড়টা তৈরি হলেই হয়। আমি ওর উপর সূর্য্যমুখী ফুল তুলতে দিয়েছি, কিন্তু সেলাইওয়ালিরা কুঁড়ে।"

গেলো সে উড়ে নদীর উপর দিয়ে, দেখলো জাহাজের মাস্তুলে-মাস্তুলে আলো জ্বলছে; বন্দরের ধারে বেচা-কেনার ভিড়, দাঁড়িপাল্লায় কত টাকা-পয়সা মাপা হচ্ছে। তারপরে সেই জীর্ণ বাড়িতে পৌঁছিয়ে সে ভিতরে উঁকি দিলে। ছোট্ট ছেলেটি বিছানায় শুয়ে জ্বরের ঘোরে ছটফট্ করছে, মা ক্লান্ত হ'য়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। সোয়ালো ঢুকলো ঘরে, মস্ত পান্নাটা রাখলো মেয়েটির কোলের উপর, তারপর আস্তে বিছানার উপর দিয়ে উড়লো, ঠাণ্ডা হাওয়া লাগলো ছেলেটির কপালে। "কী ঠাণ্ডা," ছেলেটি বললে, "নিশ্চয়ই আমি ভালো হয়ে উঠেছি।" ব'লে সে ঘুমিয়ে পড়লো।

তারপর সোয়ালো সুখী রাজপুত্রের কাছে ফিরে গিয়ে সে যা করে' এসেছে সব বললে। "ভারি অদ্ভুত। এত তো শীত, কিন্তু এখন আমার মোটেও ঠাণ্ডা লাগছে না।"

রাজপুত্র বললে "তুমি একটা ভাল কাজ ক'রে এসেছো কি না, তাই ও-রকম লাগছে।" কথাটা শুনে ছোট সোয়ালো ভাবতে লাগলো, একটু পরেই পড়লো ঘুমিয়ে। ভাবতে আরম্ভ করলেই তার ঘুম পেয়ে যেত।

যখন ভোর হ'লো সে নদীতে গেল স্নান করতে। সে সময় পুলের উপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে পক্ষীতত্ত্বের অধ্যাপক বলে উঠলেন, "এ তো বড় আশ্চর্য্য ঘটনা ' শীতকালে সোয়ালো !" তারপর তিনি এ-বিষয়ে মস্ত লম্বা চিঠি লিখলেন খবরের কাগজে। সে চিঠি সকলেই আওড়াতে লাগলো, কেননা তাতে এমন অনেক কথা ছিলো যার মানে কেউ জানে না।

"আজ রাত্রে আমি যাবো মিশরদেশে।" কথাটা ভেবে সোয়ালোর মনে খুব ফুর্ত্তি হ'লো। সেই সহরের যত বড়ো বড়ো বাড়ি আর স্তম্ভ সব সে দেখে বেড়ালো, গির্জ্জার চূড়ায় বসে কাটালো অনেকক্ষণ। যেখানেই সে গেলো, চড়ুই পাখিরা কিচমিচ শব্দ ক'রে বলতে লাগলো, "দেখেছো এই বিদেশীকে। একজন কেউ-কেটা হবে !" আর সে কথা শুনে সোয়ালোর ফুর্ত্তি আরো বেড়েই গেলো।

চাঁদ যখন উঠলো, সে ফিরে গেলো সুখী রাজপুত্রের কাছে। "মিশরদেশে কোন কাজ থাকে তো বলো। আমি এখনই রওনা হচ্ছি।"

"ওগো সোয়ালো, ওগো ছোট্ট পাখি" রাজপুত্র বললে, "তুমি কি আর এক রাত্রি আমার সঙ্গে থাকবে না ?"

"মিশরদেশে সবাই আমার প্রতীক্ষা করছে," সোয়ালো বললে, "কাল আমার বন্ধুরা দ্বিতীয় জলপ্রপাত পর্য্যন্ত উড়ে যাবে। সেখানে লম্বা লম্বা ঘাসের মধ্যে জলঘোড়ারা খেলা করছে, আর লাল পাথরের প্রকাণ্ড সিংহাসনে বসে আছেন দেবতা মেমন। তিনি সমস্ত রাত বসে তারাদের দেখেন, আর ভোরবেলায় শুকতারা যখন জ্বলজ্বল করে তখন একবার আনন্দধ্বনি করে' ওঠেন, তারপর চুপ। দুপুরবেলায় হলুদরঙের সিংহেরা আসে ঝরণার ধারে জল খেতে। চোখ

তাদের টল্‌টলে সবুজ, আর তাদের গর্জ্জন জলপ্রপাতের শব্দের চেয়েও ভয়ানক।

রাজপুত্র বল্‌লে, "সোয়ালো, সোয়ালো, ওগো ছোট্ট পাখি, সহর পার হয়ে অনেক দূরে আমি দেখতে পাচ্ছি ছোট্ট চিলকোঠার ঘরে এক যুবক ব'সে আছে টেবিলে হাত রেখে। টেবিল ভরা কাগজ পত্র, আর পাশে, একটা গেলাসে শুকিয়ে যাওয়া একগুচ্ছ ফুল। চুল তার বাদামী রঙের, ঠোঁট তার ডালিম ফলের মতো লাল, বড়ো বড়ো চোখ দু'টি যেন স্বপ্নে ভরা। থিয়েটারওয়ালাদের জন্য সে একটি নাটক লিখতে চেষ্টা করছে, কিন্তু তার এত শীত করছেযে আর লিখতে পারছে না ঘরে তার আগুন নেই, ক্ষিদেয় সে অবসন্ন।"

সোয়ালোর মনটা আসলে বেশ ভালো, তাই সে বল্‌লে : "আচ্ছা থাকবো তোমার সঙ্গে আর এক রাত্রি। কী করতে হবে বলো। আর একটা পান্না দিয়ে আসব ওকে ?"

'হায়রে' আমার যে আর পান্না নেই, এখন আমার চোখ দুটিই সম্বল। এই যে নীলা দেখছো, ভারতবর্ষ থেকে হাজার হাজার বছর আগে এরা এসেছিলো, এদের মতো আর পৃথিবীতে নাই। এর একটা উপ্‌ড়ে নিয়ে সেই যুবককে দিয়ে এসো। তা' বেচে সে কাঠ কিনতে পারবে, খাবার কিনতে পারবে, শেষ করতে পারবে তার নাটক!'

'রজপুত্র, এ আমি কিছুতেই পারবো না', ব'লে সোয়ালো কাঁদতে আরম্ভ করলে।

'সোয়ালো' সেয়ালো, লক্ষ্মী পাখি, আমি যা বলছি তা-ই করো।'

সোয়ালো আর কি করে, রাজপুত্রের এক চোখ উপ্‌ড়ে নিয়ে উড়ে গেল সে সেই যুবকের চিলকোঠায়। ঘরের ছাতে একটা গর্ত্ত ছিলো, তাই তার পৌঁছতে কিছুই কষ্ট হল না। যুবকটি দু'হাতে মুখ ঢেকে বসেছিলো, তাই পাখার শব্দ

সে শুনতে পেলো না। যখন সে চোখ মেললো সে দেখলো একটি অপরূপ নীলা তার শুকিয়ে-যাওয়া ফুলগুলির মধ্যে পড়ে আছে।

'তাহ'লে ওরা আমাকে বুঝতে শিখেছে,' সে ব'লে উঠলো। 'এটি নিশ্চয়ই আমার লেখার কোনো ভক্ত দিয়ে গেছে। এবারে নাটকটা শেষ করা যাক্।' তার দস্তুরমত মন ভালো হ'য়ে গেলো।

সে দেখলো একটি অপরূপ নীলা তার শুকিয়ে-যাওয়া ফুলগুলির মধ্যে পড়ে আছে।

সোয়ালো পরের দিন বেড়াতে গেলো বন্দরে। মস্ত একটা জাহাজের মাস্তুলের উপর ব'সে ব'সে সে দেখতে লাগলো খালাসিরা খোলের ভিতর থেকে প্রকাণ্ড সব সিন্দুক দড়ি দিয়ে টেনে টেনে তুলছে। একটা উঠে আসে, আর তারা চেঁচিয়ে ওঠে: 'হেঁইয়ো জোয়ান, হেঁইয়ো।' 'আমি যাচ্ছি মিশরদেশে,' সে বললে। কিন্তু তার কথা কেউ শুনলো না, আর চাঁদ যখন উঠলো সে উড়ে ফিরে গেলো সুখী রাজপুত্রের কাছে।

'তোমার কাছ থেকে বিদায় নিতে এলাম।'

'সোয়ালো, ওগো সোয়ালো, লক্ষ্মী পাখি আর একটা রাত্রি কি আমার কাছে তুমি থাকবে না?'

সোয়ালো বললে, 'এখন শীতকাল' শিগ্‌গিরই বরফ পড়া সুরু হবে। মিশরদেশে তাল-খেজুরের পাতায় পাতায় চমৎকার মিষ্টি রোদ, আর কুমীরগুলো কাদার মধ্যে শুয়ে অলসভাবে চারিদিকে তাকাচ্ছে। আমার বন্ধুরা বালবেকের
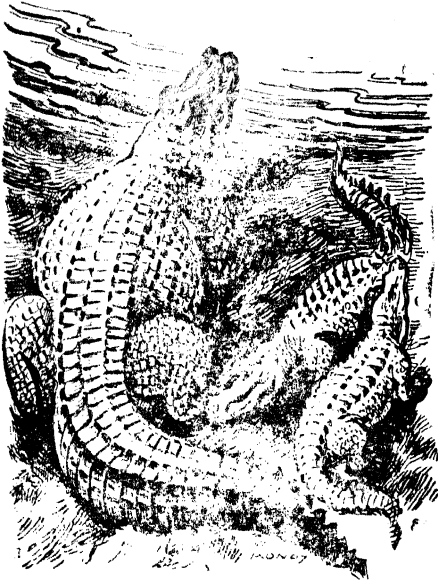
কুমীরগুলো কাদার মধ্যে শুয়ে অলসভাবে চারিদিকে তাকাচ্ছে

মন্দিরে বাঁধছে বাসা, ফুটফুটে সাদা আর গোলাপি ঘুঘুরা তাদের দেখছে আর নিজেদের মধ্যে কূ-কূ করছে। শোনো রাজপুত্র, আমাকে এখন যেতেই হবে;

কিন্তু তোমার কথা কখনো আমি ভুলবো না ; আর সামনের বসন্তকালে, যে মণি দুটো তুমি দিয়ে দিলে, তার বদলে খুব সুন্দর পান্না আর নীলা নিয়ে আসবো তোমার জন্যে। পান্না হবে লাল, গোলাপের চেয়েও লাল আর নীলা হবে বিরাট সমুদ্রের মতো নীল।'

সুখী রাজপুত্র বললে : নিচের ঐ পার্কে একটি ছোটো মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সে দেশলাই বেচে। তার দেশলাইগুলো সব নর্দ্দমায় প'ড়ে নষ্ট হ'য়ে গেছে। এদিকে বাড়িতে কিছু পয়সা নিয়ে যেতে না পারলে তার বাপ তাকে ধ'রে মারবে। না আছে তার জুতো, না আছে মোজা, মাথায় টুপিও নেই। তুমি আমার আর একটা চোখ উপড়ে নিয়ে তাকে দিয়ে এসো, তাহ'লেই তার বাপ আর তাকে মারবে না।

সোয়ালো বললে : 'আরো এক রাত্রি থাকবো আমি তোমার সঙ্গে, কিন্তু তোমার চোখ আমি উপড়ে তুলবো কী ক'রে ? তাহ'লে তুমি একেবারে অন্ধ হয়ে যাবে যে।'

'সোয়ালো, ওগো সোয়ালো, ছোট্ট সোয়ালো, আমি যা বলছি তাই করো,' বললে রাজপুত্র।

সোয়ালো আর কী করে, রাজপুত্রের বাকি চোখটি তুলে নিয়ে সোঁ করে উড়ে গেলো। ছোট্ট দেশলাইওয়ালির পাশ দিয়ে যেতে যেতে নীলাটা ফেলে দিলে তার হাতের মুঠোর মধ্যে। মেয়েটি চেঁচিয়ে ব'লে উঠলো : 'বাঃ, কী সুন্দর এক টুকরো কাঁচ', তারপর হাসতে হাসতে দৌড় দিলে বাড়ীর দিকে।

সোয়ালো রাজপুত্রের কাছে ফিরে এসে বললে, 'তুমি তো অন্ধ হ'য়ে গেলে। এখন আমি তোমার কাছেই বরাবর থাকবো।'

'না, না, তা হ'তে পারে না,' রাজপুত্র বললে, 'শোনো সোয়ালো, তুমি আজই মিশরদেশে চলে যাও।'

'আমি তোমার কাছেই বরাবর থাকবো', ব'লে সে ঘুমিয়ে পড়লো রাজপুত্রের

পায়ের তলায়।

পরের দিন রাজপুত্রের কাঁধে ব'সে ব'সে সে তাকে কত অদ্ভুত দেশের কত অদ্ভুত গল্প শোনালো। শোনালো লাল সারসপাখির কথা, নীলনদীর ধারে লম্বা সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যারা ঠোঁটের ফাঁকে সোনালি মাছ ধরে; শোনালো ফিঙ্কস্‌এর গল্প, সে সব জানে, যার বয়েস পৃথিবীর সমান আর মরুভূমিতে যার বাসা; শোনালো সওদাগরের গল্প, যারা উটেদের পাশে-পাশে আস্তে হেঁটে চলে যায় অ্যাম্বরের মালা হাতে নিয়ে; আর চাঁদের পাহাড়ের রাজার গল্প, যে মেহগনির মত কালো, আর পুজো করে প্রকাণ্ড একটা স্ফটিকের; আর মস্ত সবুজ সাপের গল্প, যে ঘুমিয়ে থাকে খেজুর গাছের ছায়ায় আর মধু খায় কুড়িজন পুরোহিতের হাত থেকে; আর ক্ষুদে মানুষের গল্প, যারা চওড়া শালপাতার চ'ড়ে বড়ো বড়ো হ্রদ পার হ'য়ে যায় আর প্রজাপতিদের সঙ্গে যাদের যুদ্ধ বেধেই আছে।
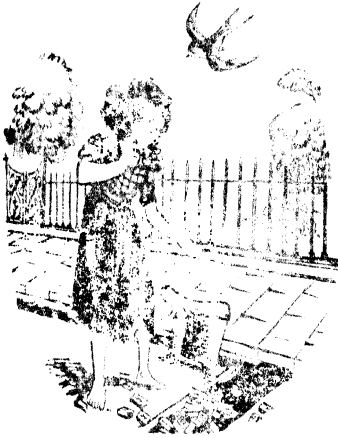
ছোট্ট দেশলাইওয়ালির পাশ দিয়ে [illegible]……

'ওগো ছোট্ট সোয়ালো', রাজপুত্র বললে, 'তুমি তো আমাকে অনেক অদ্ভুত কথা শোনালে, কিন্তু মানুষের দুঃখ অন্য সব কিছুর চেয়ে বেশী অদ্ভুত। দুঃখের মতো এত বড়ো রহস্য আর নেই।

ওগো সোয়ালো, তুমি আমার এই সহরের উপর দিয়ে উড়ে এসো, তারপর আমাকে বলো সেখানে কী দেখলে।

উড়ে বেড়ালো সোয়ালো মস্ত সহরের উপর দিয়ে। দেখলে বড়োলোকেরা ফুর্তি করছে তাদের চমৎকার বাড়ীর মধ্যে আর ভিখিরিরা ব'সে আছে ফটকের বাইরে। অন্ধকার গলির ভিতর দিয়ে সে উড়ে গেলো, দেখলে, খেতে না পাওয়া ছেলেমেয়েরা ফ্যাকাশে সাদা মুখে কালো কালো রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছে, একটা সাঁকোর তলায় সে দেখলে দুটি ছেলে পরস্পরকে জড়িয়ে শুয়ে আছে। কোনোরকমে যদি শরীর গরম থাকে। 'উঃ, কী খিদে পেয়েছে'। তারা বললে। এমন সময় পাহারাওলা এসে চেঁচিয়ে উঠলো: হেই—ওখানে শুয়েছিস কেন? ওঠ্।' তারপর ওরা উঠে চ'লে গেলো বৃষ্টির মধ্যে।

সোয়ালো ফিরে এসে রাজপুত্রকে সব কথা বললে।

রাজপুত্র বললে, 'আমার সমস্ত শরীর পাৎলা সোনার পাতে মোড়া। তুমি প্রত্যেকটি পাতা তুলে নাও, বিলিয়ে দাও ঐ গরীবদের মধ্যে। যারা বেঁচে আছে, তাদের ধারণা যে সোনাতেই সুখ।'

পাতার পর পাতা, সোয়ালো পাৎলা সোনা খুলে ফেলতে লাগলো—শেষ পর্য্যন্ত সুখী রাজপুত্রের চেহারা দেখালো ম্যাটমেটে ছাই রঙের। পাতার পর পাতা, সে বিলিয়ে দিলে সেই পাৎলা সোনা গরীবদের মধ্যে। ছোটদের মুখের লাল আভা এলো ফিরে, হাসতে হাসতে তারা রাস্তায় ছুটোছুটি ক'রে খেলায় মাতলো: 'আমরা খেয়েছি, আমরা খেয়েছি! এই কথা বলে চাঁচাতে লাগলো তারা।

তারপর বরফ পড়া শুরু হ'লো, সঙ্গে সঙ্গেই সব জ'মে যেতে লাগলো। রাস্তাগুলো এমন সাদা আর চকচকে যেন রূপোয় তৈরী, কাচের তলোয়ারের মত লম্বা লম্বা বরফের পাত বাড়ীগুলোর চাল থেকে ঝুলে আছে। ফারের জামা না প'রে ছোটো ছেলেরা লাল টুপি পরে বরফের উপর স্কেটিং সুরু করে দিয়েছে।

বেচারা সোয়ালো! দিন দিন সে ঠাণ্ডা হ'য়ে যাচ্ছে, আরো ঠাণ্ডা কিন্তু রাজপুত্রকে ছেড়ে সে কিছুতেই যাবে না, তাকে সে বড্ড ভালোবাসে। রুটিওয়ালার দরজা থেকে লুকিয়ে সে রুটির গুঁড়ো কুড়িয়ে নেয়, আর পাখা ঝাপটিয়ে ঝাপটিয়ে শরীর গরম রাখবার চেষ্টা করে।

শেষটায় সে বুঝতে পারলে যে সে মরতে বসেছে! যেটুকু শক্তি তার বাকি ছিলো সব জড়ো ক'রে আরো একবার রাজপুত্রের কাঁধে সে চড়ে বসলো। 'এবার তবে আমাকে বিদায় দাও।'

'এতদিনে মিশরদেশে যাচ্ছো তাহ'লে—খুব খুসি হলাম। তোমাকে আমার খুব ভাল লেগেছে!'

সোয়ালো বললে: 'আমি যেখানে যাচ্ছি সে মিশর দেশ নয়। আমি যাচ্ছি মৃত্যুর দেশে। মৃত্যু তো ঘুমেরই ভাই—নয় কি?'

এই ব'লে সে ম'রে প'ড়ে গেলো রাজপুত্রের পায়ের তলায়।

এই সময়ে মূর্তিটার ভিতর থেকে অদ্ভুত একটা আওয়াজ বেরুলো, যেন কিছু ফেটে ভেঙ্গে গেলো। আর সত্যি সত্যি সেই সীসের হৃদয় ভেঙে গেলো ঠিক দু'টুকরো হ'য়ে। সত্যি ভয়ানক বরফ পড়া বটে!

পরের দিন খুব ভোরে মেয়র সায়েব কাউন্সিলরদের নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছেন নিচের পার্কে। উঁচু থামটার ধার দিয়ে যেতে যেতে তিনি উপরের দিকে তাকিয়ে ব'লে উঠলেন: 'আহা! আমাদের সুখী রাজপুত্রের এমন বিশ্রী চেহারা কেন?'

'সত্যি, কী বিশ্রী!' কাউন্সিলররা একসঙ্গে ব'লে উঠলেন। মেয়র সায়েব যা বলতেন, তাঁরা সবাই সব সময় তক্ষুনি সায় দিতেন তাতে। তারপর তাঁরা দেখতে গেলেন ব্যাপারখানা কী।

মেয়র সায়েব বললেন, 'তলোয়ার থেকে পান্না গেছে, চোখ থেকে নীলা গেছে—এখন আর ও মোটে সোনারই নয়। সত্যি বলতে, রাস্তার ভিখিরির প্রায় কাছাকাছি।'

সুখী রাজপুত্র

'ভিখিরির কাছাকাছি!' কাউন্সিলররা ব'লে উঠলেন।

'আরে, পায়ের কাছে মরা একটা পাখিও যে!' নাঃ, একটা আইন জারি করতে হবে যে কোনো পাখি এখানে মরতে পারবে না।' সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কেরানি কথাটা টুকে নিলে।

তারপর সুখী রাজপুত্রের মূর্তিকে টেনে নামিয়ে ফেলা হ'লো। রাজপুত্র এখন আর সুন্দর নন, কাজেই তাঁকে দিয়ে আর দরকার নেই, বললেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিল্পকলার অধ্যাপক।

তারপর সেই মূর্তিকে একটা হাপরে গলানো হ'লো। মেয়র সায়েব এক সভা ডাকলেন ঐ গলানো ধাতু নিয়ে কী করা হবে তার মীমাংসা করতে। 'আর একটা মূর্তি হবে অবিশ্যি', মেয়র বললেন, 'আর সে মূর্তি হবে আমার।'

'আমার!' কাউন্সিলররা প্রত্যেকে তক্ষুনি ব'লে উঠলেন, আর সে নিয়ে ঝগড়া বাঁধলো। শেষ যখন আমি তাঁদের কথা শুনেছিলুম, তখনো তাঁরা ঐ নিয়ে ঝগড়া করছিলেন।

কারখানার ম্যানেজার আর মজুররা ব'লে উঠলো: 'এ তো আশ্চর্য। এই শিষের ভাঙা হৃদপিণ্ডটা কিছুতেই গলবে না। ওটাকে ফেলে দিতে হবে।' দিলে ওরা সেটাকে ফেলে আবর্জ্জনার স্তূপের মধ্যে, সেখানে মরা সোয়ালোটাও ছিল।

ঈশ্বর তাঁর এক দেবদূতকে বললেন: 'ঐ সহরের মধ্যে সব চেয়ে দামি যে দুটি জিনিস তা আমাকে এনে দাও।' আর দেবদূত তাঁকে এনে দিলে সেই শিষের হৃৎপিণ্ড আর সেই মরা পাখি।

'ঠিক দুটি জিনিস এনেছো তুমি' বললে ঈশ্বর। 'আমার স্বর্গের বাগানে এই ছোট্ট পাখি চিরকাল ধ'রে গান করবে, আর আমার সোনার প্রাসাদে হবে সুখী রাজপুত্রের বাসা।

(Oscar Wilde-এর 'The Happy Prince' গল্পের অনুবাদ)